দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭১ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ১২ আগস্ট ২০১৯।।
২৬ শ্রাবণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।।
পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।
website : www.eswastika.com

দেশভাগ এবং একটি দুরপনেয় কলঙ্ক

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।

৭১ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১২ আগস্ট - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

নেহরুপন্থী ভারতের অভিশাপ কাটিয়ে মহীরুহ ভারতের দিকে যাত্রারম্ভ ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : ৩৭০ ধারা খারিজ কেন কালো দিন? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

তিন তালাক বিরোধী বিল পাশ করিয়ে মোদী প্রমাণ করলেন তিনি শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ▯ অমিত শাহ ▯ ৮

ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের পরেও কি ভারত স্বস্তি পাবে না? ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১১

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ ▯ তথাগত রায় ▯ ১৩

মৈরাংয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

স্বাধীনতা, ভারতভাগ ও শ্যামাপ্রসাদ ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ ▯ ২১

দেশভাগ এবং বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রতারণা ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৩

'অখণ্ড স্বাধীন বাঙ্গলা' গড়ার নামে হিন্দু স্বার্থকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন নেতাজী-ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু ▯ সুজিত রায় ▯ ২৪

দেশভাগ ও স্বাধীন আন্দোলনে কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৬

দেশভাগ এবং একটি দুরপনেয় কলঙ্ক ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৮

রক্ষাবন্ধন : ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকউৎসব ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

বৌবাজার ঠাকুরবাড়ির ঝুলনযাত্রা ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

শ্রীঅরবিন্দের ভারতবর্ষ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

মোদী সরকারের উদ্যোগে এক মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ৪৩

গান্ধীজীর অপরিমিত মুসলমান তোষণই দেশভাগ ত্বরান্বিত করেছিল ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮** ▯ ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯**

প্রকাশিত হবে
১৯ আগস্ট
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৯ আগস্ট
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মিশরে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক চরিত্র সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে প্রমাণ করেছিলেন। গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থ ইন্ডিকার সন্ধান না পাওয়া গেলেও, ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজন্যবর্গের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি শুধু ভারতবর্ষেই নায়ক? না, তা নয়। কারণ, সুদূর মিশরেও ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতি। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— মিশরে শ্রীকৃষ্ণ। প্রকাশিত হবে এই বিষয়ে একাধিক তথ্যসমৃদ্ধ রচনা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে

এই বৎসরের ১৫ আগস্ট এক নূতন সংকল্পে উজ্জীবিত ভারতবর্ষকে দেখিবে ভারতবাসী। দীর্ঘ সাতটি দশকের গ্লানি ক্লেদ হইতে মুক্ত হইয়া এক নূতন ভারতবর্ষকে উন্নত শিরে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিবে বিশ্ববাসী এই বৎসরের স্বাধীনতা দিবসে। এই বৎসরটি আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৩তম বর্ষ। এই ৭৩তম বর্ষেই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এই সরকারের দ্বিতীয়বারের জন্য প্রত্যাবর্তনটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই যে, স্বাধীনতার ৭৩ বর্ষ পূর্তি হইবার প্রাক্ মুহূর্তে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নির্বাচকমণ্ডলী সুস্পষ্ট মতামত দিয়াছেন যে, ভারত বিরোধী শক্তির হস্তে নয়, ভারতীয় পরম্পরায় আস্থাশীল এক জাতীয়তাবাদী নেতার হস্তেই ভারতের ভার অর্পণ করিতে তাহারা ইচ্ছুক। ভারতীয় পরম্পরায় আস্থাশীল এবং জাতীয়তাবাদী নেতা নরেন্দ্র মোদী তাই দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীকে হতাশ করেন নাই, বরং আপামর ভারতবাসীর দীর্ঘ সত্তর বৎসরের এক অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘদিনের এক দাবি পূরণ করিয়াছেন স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দুইটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করিয়াছে।

প্রথমটি হইল, আইন প্রণয়ন করিয়া তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধকরণ। দীর্ঘ সাতটি দশকে মুসলমান তোষণের রাজনীতির পথে না হাঁটিয়া নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা মুসলমান নারীর পাশে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র মোদীর সরকার একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে, মুসলমান সমাজকে তাহারা শুধু ভোটের যন্ত্র মনে করে না। বরং, মুসলমান সমাজকে, বিশেষত নির্যাতিতা মুসলমান মহিলাদের শিক্ষা এবং প্রগতির আলোকে আলোকিত করিতে চায়। সতীদাহ প্রথা রদ এবং বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি প্রদানের মতোই তিন তালাক নিষিদ্ধকরণের এই আইন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি অবশ্যই হইল কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা দুইটি বাতিল। এবং জম্মু ও কাশ্মীর হইতে লাদাখের পৃথকীকরণ। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবিটি দীর্ঘদিনের। বস্তুত শেখ আবদুল্লাহকে তুষ্টিকরণের হেতু জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরে এই ধারাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এবং প্রথমাবধি এই ধারাটিই কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ হইয়াও কাশ্মীরের জন্য কেন পৃথক সংবিধান, পৃথক নিশান হইবে এই যুক্তিপূর্ণ দাবিটি উত্থাপন করিয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'এক প্রধান, এক নিশান, এক বিধান' এই দাবিতে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর অভিযান করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই কাশ্মীরেই তিনি আত্মবলিদান করিয়াছেন। এই ৩৭০ ধারার বলে বলীয়ান হইয়াই কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি অদ্যাবধি ভারতীয় মূল স্রোত হইতে কাশ্মীরকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আর মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা ইহাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ৩৭০ ধারা বাতিল করিয়া নরেন্দ্র মোদীর সরকার বুঝাইয়া দিয়োছে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং কাশ্মীরে আর কোনোরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপকে তাহারা প্রশ্রয় দিতে রাজি নহে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি এর অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর কী উপায়েই বা হইতে পারিত! এরই পাশাপাশি কাশ্মীর হইত লাদাখকে পৃথক করিয়া দুইটিকেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করিয়াও সরকার বুঝাইয়া দিয়াছে, কাশ্মীরে শান্তি ফিরাইতে সবরকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ করিতে তাহারা প্রস্তুত।

এতদ্ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের মানুষ আশা করেন আরও অন্তত দুইটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ এবং দ্রুত পদক্ষেপ করিবে। একটি হইল, সমগ্র দেশের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে এক আইনের আওতায় আনা। এবং দ্বিতীয়টি হইল, যত দ্রুত সম্ভব রামমন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করা। মনে রাখিতে হইবে, শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আবেগের কেন্দ্রস্থল। তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিলে ভারতবর্ষকেই অবজ্ঞা করা হয়।

সুভাষিতম্

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তুপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধিবিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ।।

অন্তঃকরণে শুদ্ধতা ভালো ভালো বস্তু সংগ্রহের দ্বারা হয় না, ভালো কর্মের মাধ্যমেই তা হয়। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ ভালো চিন্তাভাবনার দ্বারাই করা যায়, কোটি কোটি নামমাত্র কাজের দ্বারা নয়।

নেহরুপন্থী ভারতের অভিশাপ কাটিয়ে মহীরুহ ভারতের দিকে যাত্রারম্ভ

বিশ্বামিত্র-র কলম

নাঃ! নেহরুপন্থী ভারতের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি আর ঠেকানো গেল না। ৩৭০ ধারার প্রথমাংশটুকু বাদে বাকিটা এবং সংবিধানের ৩৫এ ধারা বাতিলের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী ক্লেদাক্ত ভারতবর্ষের ছবিটা অনেকটাই পাল্টে গেল। স্বাধীনতার পরে বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ যত না জর্জরিত হয়েছে, তার থেকে ঢের বেশি ঘরশত্রুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো পার্লামেন্টেরিয়ান খুব কমই এসেছেন। ব্রিটিশ আমলেও এ জিনিস কোনওদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি পরিকল্পনামাফিক বিনা চিকিৎসায়, সম্ভবত বিষপ্রয়োগে কোনো রাজনৈতিক নেতাকে এমন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা যেতে পারে, শেখ আবদুল্লা-জওহরলাল নেহরু তা করে দেখিয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ বুঝতে পারেননি তাঁর মুসলমান প্রজারা, আর রাজানুগত্যে পরিপূর্ণ নেই, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জিন্নার সাহচর্যই তখন তাদের কাম্য। তাই প্রিন্সলি স্টেটের রাজবাহাদুর হরি সিংহের স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য গঠনের প্রাথমিক ইচ্ছাটুকু থাকলেও তিনি ভারতেরই হাত ধরতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের হাত থেকে বাঁচতে। বিস্তারিত ইতিহাসে যাব না, মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সকলেই তা জেনে ফেলেছেন; শুধু অভাগা ভারতের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অমার্জনীয় ভুলে ভূস্বর্গ আর স্বর্গ রইল না, নারকীয় জঙ্গি তাণ্ডবের সাক্ষী হয়ে রইল বিগত ৭২ বছর ধরে। এই পরিস্থিতি এবার পাল্টাবে আশা রাখা যায়। এক দেশ দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই নিশান— এতদিন এই ছিল ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের প্রকৃত রূপ। কোনও সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে এই ব্যবস্থা কি চালু আছে যে সেই দেশের অঙ্গরাজ্য দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, আবার স্বায়ত্তশাসনের যাবতীয় স্বত্বও তারা পেয়ে যাবে। যে স্বত্বের বলে 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ' নামক একটি অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো, যে 'জাতীয়তাবাদে'র বলি হলেন আমাদের দেশের অসংখ্য সেনা-জওয়ান, নিরাপত্তারক্ষী। শুধু তাই নয়, 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' গোষ্ঠীর উদ্ভব হলো, এদের চিহ্নিত করা হতো 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' নামে, এখন বলা হয় 'টুকরে গ্যাং', দেশকে টুকরো টুকরো করাই যাদের লক্ষ্য, এই বিচ্ছিন্নতাবাদের এপিসেন্টার হলো কাশ্মীর, তারপর উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এখন পশ্চিমবঙ্গে এরা 'সেফ হেভেন' গড়ে তুলেছে।

ফলে দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে কাশ্মীর ভারতের গলায় কাঁটা হয়ে আটকেছিল। আমেরিকার নাক গলানোর চেষ্টা, গণভোটের দাবি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরকে 'বিতর্কিত' করে তুলেছিল। কখনও রাষ্ট্রপুঞ্জ, কখনও চীন হামেশাই কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে ভারতের মানচিত্র বাজারে ছেড়ে দিয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। আর এই সবের মূলে ছিল সংবিধানের দুই ধারা, ৩৭০ ধারার বি এবং সি অনুচ্ছেদ ও ৩৫ এ ধারা। ভারতে থেকে ভারতেরই খেয়ে পরে ভারতেরই সর্বনাশ করার এই ধারা অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে খসে পড়ল আরও একটি মিথ যার নাম 'নেহরুপন্থী ভারত'। যে ভারত বিশ্বের দরবারে তার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলেও 'সেকুলারিজম' নামক এমন এক বস্তু ভারতবর্ষে আমদানি করতে পেরেছিল যা ভারতকে দুর্বল করতে বহিঃশত্রুদের আর দরকার হয়নি, ঘরের শত্রুরাই যা করার করে দিয়েছিল।

এবার দিন বদলেছে। নেহরুপন্থী ভারত ক্রমশ তার খোলস ছেড়ে, 'সেকুলারিজম' নামক বিষবৃক্ষের মোহ ছেড়ে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে এগোচ্ছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের নেতৃত্বে। এই ক্রমশ মহীরুহ হয়ে ওঠার যাত্রাপথ খুব সহজ নয়। মজার ব্যাপার 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' বলে যে গোষ্ঠী বহুকাল লাফালাফি করেছিল, হঠাৎ করে তারাই অমিত শাহের ঘোষণার পর ভীষণভাবে গণতন্ত্রের ভাবনায় ভাবিত হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত হলে কাশ্মীর নাকি ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবে, এমন রটনা চলছে। এতদিনে দেশের মানুষ 'আরবান নকশাল' রূপী জঙ্গিদের ওই দালালগুলোকে চিনে নিয়েছেন নিশ্চয়ই। অশান্ত কাশ্মীর শান্ত হবে কিনা, সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু ৩৭০ আর ৩৫এ ধারার বিলুপ্তি ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়েও বিশেষ সুবিধার মাপকাঠিতে 'বিতর্কিত' বিষয় হিসেবে কাশ্মীরকে পরিচিত করার অপপ্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করল।

মোদী-অমিত শাহের উদ্যোগে কালক্রমে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটবে, এ আশা করাই যায়। এক দেশে এক বিধান (সংবিধান বা আইন), এক নিশান (পতাকা) এবং একজনই প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) থাকবেন— শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন নিশ্চয়ই সার্থক হবে। ফলে নেহরুপন্থী ভারতের অবসান ঘটবেই, মহীরুহের মতো বিশ্বাসী ভারতের ছায়ায় একটু জিরোতে পারবেন; উন্নততর, সমৃদ্ধতর ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটবে, কমিউনিস্ট মুক্ত বিশ্ব আর কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ দেশবাসী আপাতত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করুন। আর গর্বভরে বলুন, কাশ্মীর আমাদেরই। ▮

৩৭০ খারিজ কেন কালো দিন?

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি,

জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করে দেওয়া তথা সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস। সেদিন রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন এ ব্যাপারে ঘোষণা করেন তার পরেই প্রতিবাদে কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গেই ওয়েলে নেমে পড়েন আপনার সাংসদরা। সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানও তোলেন। তবে কেন তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন তা স্পষ্ট ভাবে তখনও জানাননি। আমিও প্রতিবাদ করতে চাই। বলতে চাই বিজেপি কালো দিন এনে দিল গণতন্ত্রের জন্য। কিন্তু তার পিছনে কী কী কারণ দেখাব বুঝতে পারছি না। ফেসবুকে যেসব দেশপ্রেমীরা আনন্দ করছে তাদের মোক্ষম জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। একটু হেল্প করবেন দিদি প্লিজ।

রাজ্যসভায় তৃণমূলের আপনার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন বলেন, গণতন্ত্রের জন্য এটা কালো দিন। তাঁর কথায় "কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়ে সংবিধানকে ভুলে গেছে, নইলে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। কোনও রকম আলোচনা ছাড়া যে ভাবে কাশ্মীরকে ভাগ করা হলো, তা অবিশ্বাস্য। কাল তো এ ভাবেই পশ্চিমবঙ্গকে চার টুকরো করে দেবে। ওড়িশাকে ভেঙে দেবে! সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে এটা মশকরা করা ছাড়া আর কিছু নয়!"

দিদি, এই যুক্তি আমার পছন্দ হচ্ছে না। জম্মু ও কাশ্মীর আর পশ্চিমবঙ্গ যে এক নয়, সেটাই ডেরেকবাবু জানেন না। আপনি প্লিজ একটু প্রশান্ত কিশোর দাদাকে জিজ্ঞেস করে বলে দেবেন। ঠিক কী কী কারণ দেখিয়ে এটাকে গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন বলা যায়। প্লিজ দিদি, প্লিজ।

লোকসভায় একাই তিনশো-র বেশি আসন দখল করতে পারলেও রাজ্যসভায় এখনও সংখ্যালঘু বিজেপি তথা এনডিএ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই দেখা যায়, বিল পেশ হওয়া মাত্রই বিজু জনতা দল, বহুজন সমাজ পার্টি, এআইডিএমকে, জগমোহনের ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং দিদি আপনার প্রিয় বন্ধুবর অরবিন্দ কেজিওয়ালের আম আদমি পার্টিও সরকারকে সমর্থন জানায়। সরকারের প্রস্তাবে শুধু বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে এবং সংযুক্ত জনতা দল। আমি জানি দিদি, আপনিই ঠিক। আমি ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতা করতে চাই। একটু যুক্তিগুলো বলে দিন না দিদি প্লিজ।

সবাই যা বলছে তাতে দেখছি খারাপ কিছুই নেই। আমি তাই ঘেঁটে যাচ্ছি। ওদের পাল্টা যুক্তি আমার চাইই চাই। ওরা যা যা বলছে সেটা নম্বর করে দিলাম।

১। এতদিন অবশিষ্ট ভারতের মানুষেরা কাশ্মীরে জমি কিনতে পারতো না। অর্থাৎ আমাদেরই দেশের একটি অংশে আমাদেরই অধিকার সঙ্কুচিত ছিল।

২। ৩৭০ উঠে গেলে আমরা এক ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। কাশ্মীরের মানুষের যেমন আমার পাড়ায় জমি কিনে বাস করার বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার আছে, আমারও কাশ্মীরে বসবাসের বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার আছে— এই বোধ আমাদের জাতীয় সংহতি মজবুত করবে।

৩। ৩৭০ ধারা তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত সরকার যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তা বিশ্বে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবে। ভারত যে তথাকথিত কোনো আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে না— এই বার্তা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বন্ধুর সংখ্যা বাড়াবে।

৪। পাকিস্তান, বাংলাদেশে বসে যারা দিনরাত ভারতে অশান্তির পরিকল্পনা করে তারাও একটু সমঝে চলবে।

৫। যে সরকার দুম করে ৩৭০ তুলে দিতে পারে, সে সরকার ঘাড় ধরে আবার বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে পারে এই আশঙ্কা থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা সতর্ক হবে।

৬। ৩৭০ ধারার বিলোপ আমাদের রাষ্ট্রনীতির আরও অনেক দুর্বল দিকের পরিবর্তনের সূচনা করবে যার সুফল সারা দেশের মানুষ ভোগ করবেন। দেশের সরকারের প্রতি শিক্ষিত, উদ্যমী, দেশপ্রেমী মানুষের আস্থা বাড়লে তারাও উৎসাহিত হবেন দেশ গড়ার কাজে। ওরা আরও বলছে যে, ৩৭০ ধারার বিলোপ যে ঐতিহাসিক ঝটকা দিয়েছে তা হাজা-মজা ভাবনা চিন্তা দূরে সরিয়ে দিয়ে নতুন দেশ গড়ার কাজে গতি সঞ্চার করবে।

এসব দেখে পড়ে আমার কেমন যেন বিজেপিকে সাপোর্ট করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা কী করে হয়! আমি তো দিদি আপনার একান্ত অনুগত ভাই। তাই আপনার কাছেই আব্দার, প্লিজ কিছু বিরোধী যুক্তি সাজিয়ে দিন। যুক্তির মতো যুক্তি।

—সুন্দর মৌলিক

তিন তালাক বিল পাশ করিয়ে মোদী প্রমাণ করলেন তিনি শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক

অতিথি কলম

অমিত শাহ

ইতিহাসে কিছু কিছু বিরল দিন আসে। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে ৩০ জুলাই ২০১৯ ঠিক এমনই একটি দিন। সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় তিন তালাক বিলের অনুমোদন পাওয়া আর পাঁচটা বিলের আইনে পরিণত হওয়া নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক ভুলের সংশোধন। একই সঙ্গে মুসলমান মহিলাদের অপহৃত মান মর্যাদার পুনরুদ্ধার। সেই অর্থে এই আইন নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এক মাইলফলক।

রাজ্যসভায় বিলটির অনুমোদন প্রমাণ করল যে মোদী সরকারের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল ও দায়বদ্ধ থাকার মাধ্যমে বিরোধীদের নিরন্তর বাধাকেও অতিক্রম করা যায়। এই সামাজিক সংস্কার সেই সমস্ত মুসলমান মহিলা যারা নীরবে দীর্ঘদিনের চলে আসা কদর্যতায় ভরা প্রথার শিকার হয়েছেন নিঃসন্দেহে তাঁদের হাতিয়ার জোগাবে।

বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হওয়া কালীন সংসদে ও সংসদের বাইরে যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছিল সেগুলির দিকে নজর দিলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা যাবে। প্রথমত, এই বিলটি পাশ করাবার ক্ষেত্রে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করা হয় তাতে ভারতে মুসলমান মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা, সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি সরকার যে কতটা দায়িত্বশীল তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে এই বিলকে ঘিরে বেআব্রু হয়ে পড়ে কংগ্রেস দলের দ্বিচারিতা। এর কারণটাও পরিষ্কার। কংগ্রেস বরাবর মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই দেখে এসেছে, ফলে সামগ্রিক মুসলমান সমাজে একটা গভীরভাবে প্রোথিত বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরই ফলে মুসলমান মহিলাদের সম্মান দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন কংগ্রেস বোধ করেনি। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ছিল তীব্র হীনমন্যতাবোধ।

আরেকটা মজার ব্যাপার এবার দেখা গেল। অতীতের মতো কংগ্রেস তার একপেশে গোঁয়ারতুমির মাধ্যমে অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে তার দিকে টেনে আনার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তারা বুঝতেও পারছে না যখন বিরোধী দলগুলি দেখে যে একটা সরকার জনহিতে ও সামগ্রিক সমাজের কল্যাণে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে কাজ করে যায় যেমনটা নরেন্দ্র মোদী সরকারের ক্ষেত্রে ঘটেছে তখন তাদের পক্ষে সরকারের পাশে দাঁড়ানোটাই স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

> “যারা তিন তালাক দেওয়াকে ক্রিমিনাল অফেন্স বা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করায় ক্ষেপে যাচ্ছেন তারা সুবিধেজনকভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন যে হিন্দু সমাজের আরও বহু প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য করে কড়া শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আগেই বলবৎ রয়েছে।”

তিন তালাক বিরোধী বিলের পক্ষে এনডিএ জোট বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন সদা স্বাগত। সেই কারণে আমরা সকল বিরোধী দলের কাছেই আবেদন করবো তারা যেন দলীয় মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়গুলিতে সরকার পক্ষকে সমর্থন করে। এই সূত্রে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের আতস কাঁচের তলায় রাখতে হবে তিন তালাক বিরোধী বিলের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকাকে। ১৯৮৫ সালে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত তিন তালাকের বলি বৃদ্ধা শাহ বানো মামলায় এই স্বামী পরিত্যক্তাকে ৫০০ টাকা মাসোহারা দেওয়ার আদেশ দেয়। আদালত এও জানায় যে মুসলমানদের ব্যক্তিগত শারিয়া আইনেও এর স্বীকৃতি আছে। ত্রিশ বছর আগের সেই লোকসভায় কংগ্রেসের চারশো সাংসদ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান মহিলাদের ওপর চলে আসা অবিচার নির্মূল করতে আদালতের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তারা সংস্কার করার ঐতিহাসিক সুযোগ হেলায় হারায়।

শুধু তাই নয়, আদালতের আদেশ কার্যকর করার পরিবর্তে রাজীব গান্ধীর সরকার মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের রক্ষণ তথাকথিত মোল্লাদের পরামর্শে ও একই সঙ্গে মুসলমান ভোটের লোভে সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করে। এর ফলে তিন তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমান মহিলাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কংগ্রেসের এই কীর্তি তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রসিদ্ধ বাম ঘেঁষা আইনজীবী ডি আর কৃষ্ণ আইয়ারকেও অবাক করে দেয়। কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খান আদালতের রায়কে ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ বলে

মনে করে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। রাজীব গান্ধী সুপ্রিম কোর্টের প্রগতিশীল সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে কাজ করতে চলেছেন এমনটা তিনি আরিফ খানকে বুঝিয়ে ছিলেন।

এরপর থেকে বছরের পর বছর বিষয়টি ঠাণ্ডাঘরে পড়েছিল। শেষমেশ মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে যখন বিলটিকে নতুন করে জনসমক্ষে এনে সংসদে তুললেন তখনও কংগ্রেস তার বিলটির প্রতি তার অতীতের ঘৃণ্য অবস্থান সম্পর্কে দোলাচলেই ছিল। কংগ্রেসের ত্রিশ বছর আগের দ্বিচারিতা ও বিভাজনের রাজনৈতিক মানসিকতায় যে কোনো পরিবর্তন হয়নি তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল। তিন তালাকের ক্ষেত্রে ত্রিশ বছর আগের রাজীব গান্ধীর করা ঐতিহাসিক ভুলের সংশোধনে এই সরকারের প্রচেষ্টাকে তারা অন্তর্ঘাত করার কৌশল নিয়েছিল। বিলটিকে রুখে দেওয়ার অপচেষ্টা থেকে এটাই বোঝা গেল যে কংগ্রেস তোষণ ও ভোটব্যাঙ্কের সস্তা রাজনীতি থেকে এক চুলও সরে আসেনি। তাই, তিন তালাক অধ্যাদেশের আইনে পরিণত হওয়া এই ধরনের রাজনীতির কারবারিদের এক চরম আঘাত।

একই সঙ্গে এই বিলের অনুমোদন ভারতের তথাকথিত উদারবাদীদেরও মুখোশ খুলে দিয়েছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে গলা ফাটান এই বিলের মাধ্যমে যখন মুসলমান মেয়েদের কিছুটা ক্ষমতায়ন হতে যাচ্ছে তাঁরা সন্দেহজনকভাবে হয় নীরব নয়তো নানা অছিলায় বিলটির বিরোধিতা করেছেন। এই স্বঘোষিত উদারবাদীরা যে আসলে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই মানবতাবাদীর মুখোশ পরে থাকেন তা ধরা পড়ে গেছে। মানবিক মূল্যবোধ দেখানোর সময় তাঁরা সরে পড়েছেন।

সেই সমস্ত লোক যারা এই আইনটি আনা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের জানা দরকার মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত তিন তালাক বেআইনি ঘোষণা করার পরও শয়ে শয়ে মুসলমান মহিলার ওপর তিন তালাক প্রয়োগ ও অত্যাচারের ঘটনার খবর আসছে। এই ধরনের চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের মোকাবিলায় কড়া আইন এনে এই কুপ্রথা বন্ধ করা একান্তই জরুরি ছিল। আর একটা কথা, এই আইনটি যে কোনো মতেই ইসলাম বিরোধী নয় তার প্রমাণ পাকিস্তান, সিরিয়া, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশ অনেক আগেই তাৎক্ষণিক মুখেমুখে বিবাহ বিচ্ছেদকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, সেই সমস্ত নারীরা যারা তিন তালাকের বিরুদ্ধে এক কঠিন ও দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চালিয়েছে তাদের আদৌ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। তারা নিতান্তই আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতো। কিন্তু তাদের ওপর তিন তালাকের নামে যে অন্যায় হয়ে আসছিল তার বিরুদ্ধে লড়ার দুর্জয় সাহস তারা দেখিয়েছিল। এই কুপ্রথাকে রদ করার বিষয়ে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লড়াই চালায় যার পরিণতিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাদের পক্ষে রায় দেন। এখন তিন তালাক অবৈধ বলে ঘোষণা করে আমাদের সরকার যে আইন পাশ করল তা এই সমস্ত মহিলাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য সাহায্য করারই প্রচেষ্টা মাত্র। অবশ্যই আইন প্রণেতা ও রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের ন্যায়সঙ্গত লড়াইকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে সঠিক ভাবে সহায়তা ও পরিচালনা করার দায়িত্ব থেকেই যায়।

আইন কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের ওপরই প্রযোজ্য হবে বলে বিরোধীরা যে রব তুলেছে তাও অসার। স্বাধীন ভারতে অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন গেড়ে বসে থাকা বহু অন্যায্য প্রথার সংস্কার করতে আইন আনা হয়েছে। হিন্দু বিবাহ আইন, খ্রিস্টান বিবাহ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ বা পণ প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত আইনগুলি কি তারই উদাহরণ নয়? যারা সুবিধেবাদী ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতায় ব্যস্ত তারা এগুলিতে কান দিতে চান না।

যারা তিন তালাক দেওয়াকে ক্রিমিনাল অফেন্স বা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করায় ক্ষেপে যাচ্ছেন তারা সুবিধেজনকভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন যে হিন্দু সমাজের আরও বহু প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য করে কড়া শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আগেই বলবৎ রয়েছে।

তিন তালাককে নিষিদ্ধ করে নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই সাহসী আইন প্রণয়ন নিশ্চিত প্রশংসার দাবি রাখে। মেয়েদের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত দেশের উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক যেমন রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর নামও একই পঙ্‌ক্তিতে একদিন শোভা পাবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা)

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে যে, লেখাপড়া করিবার জন্য কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি ট্রাস্টের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইবে। উপযুক্ত প্রমাণপত্র ও সুপারিশ সহ আবেদন গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। :—

নবম এবং দশম শ্রেণী বার্ষিক	১০০০ টাকা
একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী বার্ষিক	১৫০০ টাকা
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক	২০০০ টাকা

আবেদনপত্র সম্পাদক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট-কে করিতে হইবে।

৫.৮.২০১৯

সম্পাদক
স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

রম্যরচনা

ডেঙ্গু

ডেঙ্গু নিয়ে মন্ত্রীর বহস বেশ জমেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে হয়েছে। তাঁর নির্দেশ ছাড়া এখন বাংলাদেশ অচল। আমাদের দুই মেয়রও কম যাননি। শুনলাম মেয়রের বাণীতে ঢাকা শহর ভরে গেছে। সবাই আশা করছেন, যেহেতু মেয়র বাণী দিয়েছেন এবার মশারা বুঝবে ঠ্যালা। আসুন, মশা নিয়ে আরও কিছু বাণী শুনি। মেয়র সাইদ খোকন বলেছেন, আল্লাহ্ মাফ করলে শিগগিরই ডেঙ্গু মুক্ত করতে পারবো। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশি মশা তাঁর রাজ্যে ঢুকছে। আচ্ছা, মোদীর বিএসএফ মশা আটকাচ্ছে না কেন? কে জানে, হয়তো হাসিনা-মোদী ষড়যন্ত্র করেই ডেঙ্গু মশা দিয়ে মমতাকে ঠেকাতে চাইছেন। নারায়ণ গঞ্জের মশা নিয়ে এমপি শামিম ওসমান অরও চমৎকার বলেছেন। তাঁর মতে নমরুদ যখন অত্যাচার করছিল তখন দুনিয়াতে এই মশার উদ্ভব হয়েছিল। ঝাঁক ঝাঁক মশার কামড়ে নমরুদের মৃত্যুর একটি আষাঢ়ে গল্প আমরা ছোটোবেলায় শুনেছিলাম। শামিম ওসমান কিন্তু বলেননি কার অত্যাচারে নমরুদের মৃত্যু হয়েছে। তবে যেহেতু মশা নবাবগঞ্জের, তখন ব্যাপারটা আমাদের বুঝে নিতে হবে।

(বাংলাদেশের এক বুদ্ধিজীবীর কলমে)

উবাচ

"বিতর্কিত এই ধারার অবসানের জন্য বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক সেটাই করেছেন।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

সম্প্রতি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিলের পর রাজ্যসভায় বক্তব্যে

"কাশ্মীর নিয়ে আমার পিতৃব্য অনন্য প্রয়াস করেছিলেন। জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সে ছিল আমার কাছে বেদনার মুহূর্ত। যে আদর্শের জন্য তিনি আত্মত্যাগ করেছিলেন সেই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন আজ পূর্ণতা পেল।"

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়
শ্যামাপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের খবরে তাঁর প্রতিক্রিয়া

"আজ একটা ঐতিহাসিক দিন। এতদিন ধরে সারা ভারতের যা স্বপ্ন ছিল, আজ তা রূপায়ণ করে দেখাল মোদী সরকার। এতদিনে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করল দেশ।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি
তথা সাংসদ

রাজ্য সভায় ৩৭০ ধারা বাতিলের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে

"আমি প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অভিনন্দন জানাই। আজ আমাদের দেশ পুরোপুরি স্বাধীন হলো। আজ বালাসাহেব ঠাকরে ও অটলজীর স্বপ্নপূরণ হলো। যারা এর বিরোধিতা করছেন তাদের বলব, এই সিদ্ধান্ত দেশকে একসঙ্গে রাখার জন্য জরুরি, এর বিরোধিতা করা উচিত নয়।"

উদ্ধব ঠাকরে
শিবসেনা প্রধান

৩৭০ ধারা বাতিল প্রসঙ্গে

ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের পরেও কি ভারত স্বস্তি পাবে না?

কে. এন. মণ্ডল

ভারতের স্বাধীনতাকে যাঁরা 'ঝুটা আজাদি' বলেছেন তাঁরা বা তাদের বংশধরেরা অনেকেই এই যদৃচ্ছালব্ধ স্বাধীনতার বৃত্তিভোগী হয়ে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের চেয়েও রাজসিক এবং নিশ্চিন্ত ভোগবিলাসিতায় কালাতিপাত করছেন। আর মহাত্মা গান্ধীর মতো স্বপ্ন দ্রষ্টারা, যাঁরা স্বাধীন ভারতকে রামরাজ্য দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের হতাশা 'রামরাজ্য তো দূরস্থান, রামের নামে ধ্বনি শুনলেই কেউ কেউ উগ্র মূর্তিতে তেড়ে আসেন। জ্ঞানবানরা বলবেন— গান্ধীজীর 'রামরাজ্য' ছিল একটি আর্থ সামাজিক অবস্থান যা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের রাজত্বের মতো প্রজা সাধারণকে ন্যায় ও সুবিচার দেবে— কেউ কষ্টে আছেন জানলে রাজা শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন না' তবুও বলবো বর্তমান ভারতে উদ্দিষ্ট রামরাজ্য অসম্ভব মনে হলেও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিটি স্বাধীন ভারতে অপাঙ্‌ক্তেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উগ্রতাই রাজ্যে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নিয়ে বাড়াবাড়িতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

মহাত্মার অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামের পরে আজও কি ভারতবর্ষ অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পেরেছে? উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের তাত্ত্বিক প্রারম্ভ আর্য যুগে শুরু হলেও, জন্মসূত্রে ওই প্রভেদ চালু হয় পরবর্তীকালে, আর বঙ্গপ্রদেশে জাঁকিয়ে বসে লক্ষ্মণ সেনের সময়। শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মে জাত বিরোধ নয়, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘাত মোচনে অনেক মহামানব সচেষ্ট ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মকে 'সব ধর্মের জননী স্বরূপ' ব্যাখ্যা করেও বলেন, 'আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করছি, যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে পরমত সহিষ্ণুতা এবং সর্বজনকে গ্রহিষ্ণুতার আদর্শ। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না— সব ধর্মকে সত্য মনে করি'। পরাধীন ভারতে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় দেখে স্বামীজী ব্যথিত হয়েছিলেন তা থেকে কি ভারতমাতা মুক্তি পেয়েছে? বিবেকানন্দ বলেছেন, 'দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং অবনতির প্রধান কারণ। ভারতের দুই মহাপাপ— মেয়েদের পায়ে দলানো এবং জাতি জাতি করে গরিব গুলোকে পিষে মারা'। স্বামীজী আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'ইউরোপ-আমেরিকায় ইতর জাতিরা জেগে উঠে লড়াই করছে, ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও ভদ্রজাতেরা ছোটো জাতদের দাবাতে পারবে না। ইতর জাতের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতের কল্যাণ'। বিবেকানন্দ পুনরায় বলেছেন, 'যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নর-নারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটি বার চিন্তা করিবার অবসর পায় না--- তাহাদিগকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করি।' স্বাধীন ভারতের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে স্বামীজী বর্ণিত 'বিশ্বাস-ঘাতক'দের দাপাদাপিতে ভারতমাতা ক্রন্দরতা।

প্রসঙ্গত, 'ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ' ধারণাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষকে পিছিয়ে রেখেছে। অথচ অত্রিমুনি বর্ণিত জাতি বিবর্তনের কষ্টিপাথরে বিচার করলে ক'জন ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া যাবে? অত্রি সংহিতায় বলা আছে, 'মানুষ জন্ম মাত্রেই শূদ্র, সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ হয়, দ্বিজত্ব অর্জনের পরে বেদ পাঠের মাধ্যমে বেদ জ্ঞান লাভ হলে বিপ্র হয় এবং বেদজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকে জানতে পারলে ব্রাহ্মণ হয়।' অথচ জন্মগত জাত্যাভিমান বর্তমান ভারতের জাতি সংঘর্ষের একটি বড়ো কারণ। তবে তথাকথিত নিম্নজাতের লোকেরা শিক্ষা এবং পেশাগত অগ্রগমনের ফলে ব্যবহারিক জীবনে এবং বৈবাহিক সম্পর্কে ও তথাকথিত উচ্চবর্ণের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ায় সামাজিক ভেদাভেদ কিছুটা কমেছে। তা ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ এবং পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা নিম্নবর্গের মানুষদের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছে। স্বাধীন ভারতের নিম্নবর্গের লোকেদের রক্ষাকবচ হিসেবে বহু আইন বা বিধি প্রণীত হয়েছে— তার যথাযথ প্রয়োগ না হলেও ওইগুলো সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা বা অপরাধ নিবৃত্তিকরণের কাজ করছে। তবুও বলবো 'জাতের নামে যে বজ্জাতি' এখনো হচ্ছে তা আমাদের জাতীয় লজ্জা, যদিও তার প্রকোপ বা প্রাবল্য ক্ষীয়মাণ।

ভারতীয় গণতন্ত্রে অগ্রগতির আর একটি বড়ো অন্তরায় জাতীয় সংহতি অর্জনে ঐকমত্যের অভাব। এমনকী ভারতের ঐতিহ্যগত আদর্শ যা এই মহান দেশকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে এবং এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদান করে যেমন 'বন্দে মাতরম্' বা 'ভারতমাতা কী জয়' এতাদৃশ 'জাতীয় ধ্বনি' বা স্লোগানেও এক শ্রেণীর রাজনৈতিকদের আপত্তি বা বিরোধিতা স্বাধীন ভারতে অকল্পনীয়— কিন্তু বর্তমান। কে না জানেন যে পরাধীন ভারত ভূমির শৃঙ্খলা মোচনের সংগ্রামে ওই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে কত দেশপ্রেমিক দেশমাতৃকার বেদিতে আত্মহুতি দিয়েছেন। যেমনটি হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে 'জয় বাংলা' স্লোগানে। ওই দেশে আজ যদি কেউ বলেন যে ইসলামিক নয় বলে ওই

স্লোগানটির বিরোধী— বাংলাদেশের মানুষ তাকে ক্ষমা করবেন তো? প্রসঙ্গটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে জাতীয়তা বিরোধী যে কোনো উদ্যোগ বা অবস্থান জাতীয় ঐক্য বা অখণ্ডতার পরিপন্থী। কেননা এ ধরনের মনোভাব জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ তৈরিতে ইন্ধন জোগায় যা জাতি দাঙ্গার কারণ এমনকী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করে। একটি ধর্মীয় সংগঠনের নেতা ত্বহা সিদ্দিকির একটি সমাবেশের বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, 'মুসলমান সমাজকে কেউ যেন দুর্বল না ভাবেন— তারা চাইলে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে কলকাতায় ফাইনাল খেলতে পারেন।' প্রতিবাদকের জিজ্ঞাসা— ত্বহা সাহেব কি সুবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবের ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের (জুম্মাবার) গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্-এর কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন?

৭৩তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে একটি বক্তব্য পরিষ্কার করে বলাই ভালো। দ্বিজাতিতত্ত্বে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের পরেও কি স্বস্তি পাবে না ভারত? তাহলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা যা পেয়েছি সত্যিই কি 'ঝুটা-আজাদি? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এবং শতসহস্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর বলিদান কি বৃথা যাবে? একদিন যারা Muslims' right of self-determination তত্ত্ব আউরে ভারতবর্ষের সমন্বিত স্বাধীনতা আন্দোলনে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন, তারা একথাটা ভেবে দেখতে পারেন। কারণ, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ 'হিন্দু-মুসলমান' বিভাজনকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে। তাই দেশ বিরোধী শক্তিকে পিছন থেকে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে, ভারতমাতার শৃঙ্খলা মুক্তির আপোশহীন যোদ্ধা সুভাষ চন্দ্র বসুকে যারা 'তেজোর কুকুর' বা ফ্রান্সের পার্টেন বা নরওয়ের কুইসলিং-এর মতো বিশ্বাসঘাতক বলেছেন, তারা আত্মসমীক্ষা করুন— তবেই দেশের এবং নিজেদের মঙ্গল। বিশাল জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষ, যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় চীন, অথচ ওই দেশটি আয়তনে প্রায় ভারতের তিনগুণ। জন ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষের সমস্যা যেমন বহুবিধ— প্রকৃতিতে তা বিচিত্র। উন্নয়নমুখী ভারতে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অস্পৃশ্যতা এবং কুসংস্কার অগ্রগতির বড়ো প্রতিবন্ধক। এতৎসত্ত্বেও, সমস্যাজীর্ণ ভারত কৃষি উৎপাদন, শিল্পে- বাণিজ্যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে। ভারতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে চীনের মতো সফল না হওয়ার কারণে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে থাকলেও, দেশটির অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কাঠামো শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে, যা যে কোনো ঝাঁকুনি সহ্য করতে সক্ষম। ভারত বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ এবং দেশরক্ষা বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে কোনো বিদেশি শত্রুর চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম। আর্থিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধিশীল চীনকেও ছাড়িয়েছে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশ। তবুও অনাহারে মৃত্যুর যে কোনো খবর বেদনা দায়ক এবং তার জন্য দায়ী প্রশাসনিক অপদার্থতা। উল্লেখ্য, ভারতের সাড়ে ছয় লক্ষ গ্রামের প্রায় সর্বত্র বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পৌঁছেছে। সকল গৃহহীনদের ২০২৪ সালের মধ্যে পাকা ঘর দেওয়ার প্রকল্প নিয়েছে সরকার, এই অভিজ্ঞান প্রায় সমাপ্তির মুখে। জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সকল নাগরিকদের কাছে বিনা খরচায় ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বহুবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এতৎসত্ত্বেও, একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না যে, স্বাধীনতার সুফল ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে সমান ভাবে পৌঁছেছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খরচের টাকার সিংহভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তাদের পকেটে চলে যাচ্ছে। ফলে এক শ্রেণীর মানুষ বিপুল বৈভবের মালিক হয়েছে— যার তুলনায় সাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সামান্য বেড়েছে। সুতরাং ভারতের উন্নয়নে দুই প্রধান বাধা দুর্নীতি এবং কালোটাকার রমরমা ঠেকাতে ভারত সরকার আরও কড়া পদক্ষেপ নিক— এটাই স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর প্রত্যাশা। একথা অস্বীকার করা যায় না— উন্নয়নের সমান অংশীদার না হলেও কিন্তু সাধারণের জীবনযাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ায় গরিব মানুষ এবং শহরের বস্তিবাসীরাও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দৈনন্দিন ঘটনা সমূহ অবগত হচ্ছেন। পোশাক পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্রেও পরির্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত রাজে মহিলা এবং তফশিলি ও জনজাতিদের সংরক্ষণের সুবাদে ক্ষমতায়ন হয়েছে, পিছিয়ে পড়া ওই সমস্ত মানুষের গান্ধীজীর কাঙ্ক্ষিত 'স্বরাজ-ব্যবস্থা' বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে দেশ। এই পাওয়া-না পাওয়ার দোলাচালে সর্বপেক্ষা বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে র‍্যাডক্লিফের কলমের খোঁচায় ভারতের সীমানার ওপারে বসবাসকারী কোটি কোটি ভাইবোনেরা, যাঁরা সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের লড়াইয়ে শামিল ছিলেন। অথচ হঠাৎ করে তারা বিদেশি হয়ে গেলেন। পাকিস্তান তাদের সুনজরে কখনো দেখেনি সংগত কারণেই, যেহেতু পাকিস্তান আদায় করেছে মুসলিম লিগ, মুসলমানদের জন্য কাফেররা সেখানে অবাঞ্ছিত। পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়ে কোটি কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে জীবন এবং মা-বোনেদের সম্মান রক্ষায় ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে গরিষ্ঠাংশ মানুষ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা শহর এবং শহরতলিতে বস্তিবাসীর জীবন যাপন করছেন। অথচ তাদের পুনর্বাসনে যথাযথ ব্যবস্থা এখনো নেওয়া হয়নি। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরভাই মোদী তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে ভারতের বৃহত্তর সমাজ জীবনে পুনর্বাসিত করতে চাইছেন। আসুন, আমরা এই উদ্যোগকে সমর্থন করে স্বাধীনতার প্রাক্কালে এদের প্রতি ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় শামিল হই।

(লেখক স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন আধিকারিক)

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেবার পর লোকসভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সম্পাদিত অংশ প্রকাশ করা হলো। স. স্ব.

বুধবার, ১৯ এপ্রিল, ১৯৫০
সভা শুরু ১০.৪৫ ঘটিকা।

স্যার, সংসদীয় রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে আমার পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি দেবার জন্য আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান। আমি এই সভাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নিইনি— গভীর ও দীর্ঘ চিন্তার ফলেই নিয়েছি। বহু মানুষ, যাঁরা আমাকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছেন এবং যাঁদের আমি অত্যন্ত সম্মান করি, তাঁদের প্রতি আমি আমার দুঃখ ব্যক্ত করছি তাঁদের অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে।...

...পাকিস্তানের প্রতি আমাদের যা মনোভাব তা নিয়ে আমি কখনোই সন্তুষ্ট ছিলাম না। এই মনোভাব দুর্বল, স্ববিরোধী এবং ক্রমাগত হোঁচট খেয়ে চলা। পাকিস্তান আমাদের এই ভালোমানুষিকে দুর্বলতা হিসাবে দেখেছে। তার ফলে পাকিস্তান আরও সমস্যা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে, আমাদেরকে আরো যন্ত্রণা দিয়েছে এবং আমাদের নিজেদের চোখে আমরা হেয় হয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে আমরা রক্ষণাত্মক অবস্থানে থেকেছি এবং পাকিস্তানের কুমতলব মোকাবিলা করতে বা আবরণ সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আজকে আমার বিচার্য বিষয় সার্বিক ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নয়। আমাকে পদত্যাগ করতে যা বাধ্য করেছে তা হলো পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন নেহরু-লিয়াকত।

প্রতি পাকিস্তানি আচরণ। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন— বাঙ্গলার এই সমস্যা কোনো প্রাদেশিক সমস্যা নয়। এই সমস্যার থেকে সর্বভারতীয় কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যার সমাধানের উপর গোটা দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি, সবই নির্ভর করছে। এ দেশের বেশিরভাগ মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ চেয়েছিলেন, যদিও একথা আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি যে একটি ছোট্ট অংশ, যাঁরা দেশপ্রেমিক এবং যাঁরা দেশের মঙ্গলকামনা করেন তাঁরা চাননি— এবং এজন্য তাঁদের কষ্টস্বীকারও করতে হয়েছিল। অপরপক্ষে হিন্দুরা কেউই দেশভাগ চাননি। যখন দেখা গেল দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী তখন আমি বাঙ্গলা ভাগ করার কাজে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলাম। এর কারণ, তা না করলে গোটা বাঙ্গলা এবং সম্ভবত অসমও পাকিস্তানে চলে যেত। তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে আমি কোনোদিন দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারি। (সেই সময়) আমি এবং অন্য অনেকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছিলাম যে যদি ভবিষ্যতে পাকিস্তান সরকার তাদের উপর অত্যাচার করে, যদি তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার না দেওয়া হয়, যদি তাদের জীবন এবং মানসম্মান বিপর্যস্ত হয় বা তাদের উপরে আক্রমণ হয় তাহলে স্বাধীন ভারত চুপ করে বসে তা দেখবে না— ভারতের সরকার এবং জনসাধারণ তাঁদের ব্যাপারে সাহসের সঙ্গে তৎপর হবে। গত আড়াই বছরে তারা যে যন্ত্রণা পেয়েছে তা যথেষ্ট ভয়াবহ। এবং আজকে আমার স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাদের যে আশ্বাস আমি দিয়েছিলাম তা আমি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাখতে পারিনি— এবং শুধু এই জন্যই বর্তমান সরকারে থাকবার কোনো নৈতিক অধিকার আমার আর নেই। অতি সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্য তাদের গত আড়াই বছরের অত্যাচার ও অপমানকে ম্লান করে দিয়েছে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাবার যে অধিকার আছে তা শুধু মানবিক কারণে নয়। তারা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং বৌদ্ধিক প্রগতির জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বার্থহীন ভাবে কাজ করে গেছেন। যে সব দেশনেতা আজ আমাদের মধ্যে নেই এবং যেসব যুবক দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন তাঁরা আজ সম্মিলিত কণ্ঠে ন্যায়বিচার চাইছেন।

যে চুক্তি সই হয়েছে (৮ এপ্রিলের নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বা দিল্লি চুক্তি) তা

আমার মতে মৌলিক সমস্যাটির কোনো সমাধানই করতে পারবে না। এই অমঙ্গলের মূল আরও অনেক গভীরে নিহিত— তাপ্পি মেরে কখনো শান্তি আসবে না। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতিই হচ্ছে একটি ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করা এবং সেখান থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত বা হত্যা করা এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। এই মূলনীতির ফলে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বিপদসঙ্কুল, বীভৎস ও সংক্ষিপ্ত' ('nasty, brutish and short')। ইতিহাস যেন আমরা ভুলে না যাই। ভুলে গেলে তা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমি প্রাচীনকালের কথা বলছি না, কিন্তু যদি পাকিস্তান সৃষ্টির পরে সে দেশের হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সমস্যাটা কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়, সমস্যাটা রাজনৈতিক। যে চুক্তি করা হলো তাতে ইসলামীয় রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন সভায় পাশ করা লক্ষ্য প্রস্তাবটি (Objectives Resolution) মন দিয়ে পড়েন এবং সেই সঙ্গে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাও মাথায় রাখেন তাহলে দেখবেন যে এক জায়গায় যেমনি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে তেমনি আর এক জায়গায় সতেজে ঘোষণা করা হয়েছে, ''ইসলামে যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে তাও পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।'' পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছিলেন।

''আপনারা এও লক্ষ্য করবেন যে যখন মুসলমানরা নিজেদের ধর্মাচরণ ও ধর্মপালন করছেন তখন রাষ্ট্রের ভূমিকা কিন্তু এক নিরপেক্ষ দর্শকের মতো হবে না। তা যদি হতো তাহলে যেসব আদর্শের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান দাবি করা হয়েছিল প্রকারান্তরে সেসব আদর্শই নাকচ করে দেওয়া হতো। যে রাষ্ট্র আমরা তৈরি করতে চাইছি তার ভিত্তি হবে সেই সব আদর্শই। রাষ্ট্র এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবে যা এক প্রকৃত ইসলামি সমাজ গঠনে সহায়ক হবে— যার মানে হচ্ছে রাষ্ট্র এই ব্যাপারে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কায়েদে আজম এবং মুসলিম লিগের অন্যান্য নেতারা দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলমানদের এই পাকিস্তান দাবির মূল কারণ, মুসলমানদের এক নিজস্ব জীবনশৈলী ও আচরণবিধি আছে। বাস্তবেই, ইসলাম সমাজিক আদানপ্রদানের জন্য একটি নিয়মাবলী বেঁধে দিয়েছে এবং সমাজ প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তাকে মোকাবিলা করার জন্য দিকনির্দেশও দিয়ে দিয়েছে। ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত আচরণ ও বিশ্বাসের ব্যাপার নয়''।

আমি প্রশ্ন রাখছি, এইরকম একটি সমাজে কি কোনো হিন্দু তার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে? আমাদের প্রধানমন্ত্রীই মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই সদনে দাঁড়িয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মূল পার্থক্যটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করার যোগ্য :

''পাকিস্তানের মানুষ এবং আমরা একই জনগোষ্ঠীর। আমাদের দোষ ও গুণগুলিও এক। কিন্তু মূল সমস্যাটা হচ্ছে তারা যে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করেছে তার সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ নিয়ে''।

যে মতাদর্শ পাকিস্তান প্রচার করেছে সেটই আমাদের উদ্বেগের একমাত্র কারণ নয়। তারা যে আচরণ করেছে তা এই মতাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর ফলে সে দেশের সংখ্যালঘুদের বহুবার ইসলামি রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং আচরণ সম্বন্ধে খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই চুক্তিটি এই মৌলিক সমস্যার কোনো সমাধান দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বল। কিছু মানুষের ধারণা এই চুক্তিটিই সাম্প্রতিককালে সংখ্যালঘুর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম বিরাট প্রচেষ্টা। আমি আপাতত পঞ্জাবে যে কাণ্ড হয়েছিল তার কথা তুলছি না— যেখানে প্রশাসনের তরফে সবরকম আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়েছিল এক পৈশাচিক উপায়ে। তারপর আমরা দেখেছি পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হিন্দু বসবাস করেন এবং এঁদের ভবিষ্যৎ ভারতে আমাদের সকলের কাছে এক মহা দুশ্চিন্তার বিষয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কোনো বড়োরকম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি এবং আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কোনো মুসলমানকে ভারত ছেড়ে পাকিস্তান যেতে বাধ্য করা হয়নি, ভারতের তরফ থেকে কোনো প্ররোচনা দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। ১৯৪৮ সালে প্রথম আন্তঃ-ডমিনিয়ন চুক্তি কলকাতায় স্বাক্ষরিত হয় যার বিষয় ছিল বিশেষ করে বাঙ্গলার সমস্যা। যদি কেউ সেই চুক্তি এবং বর্তমান চুক্তি তুলনা ও বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে দেখবেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুটি চুক্তি প্রায় সমার্থকই। কিন্তু এই (১৯৪৮ সালের) চুক্তি ফলদায়ক হয়নি। ভারত সেই চুক্তি মেনে চলেছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে বহির্গমন অবারিত থেকেছে। প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, আমলা এবং মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল, দুই ডমিনিয়নের মন্ত্রীদের মধ্যেও কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু ফলের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, পাকিস্তানের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এরপর ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে দিল্লিতে একটি দ্বিতীয় আন্তঃ-ডমিনিয়ন বৈঠক হয়, আরও একটি চুক্তি সই হয়। বিষয় একই ছিল— অর্থাৎ বাঙ্গলার সংখ্যালঘুদের অধিকার। এটি প্রথম চুক্তিটির একটি প্রতিলিপি ছিল বললেই হয়। এরপর ১৯৪৯ সালে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং আরও বেশি সংখ্যক অসহায় মানুষ তাদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ভারতে এসে পৌঁছচ্ছে। অর্থাৎ অস্বীকার করার উপায় নেই যে দু-দুটি আন্তঃ -ডমিনিয়ন চুক্তি সত্ত্বেও ষোলো থেকে কুড়ি লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে ঢুকেছে। আনুমানিক দশ লক্ষ হিন্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে ভারতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই সময় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বেশ কিছু মুসলমানও সেদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বড়োরকম ঘা খায় এবং আমাদের অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই বিয়োগান্ত নাটক দেখতে হয়।

আজকে লোকের মনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভারত এবং

পকিস্তান, দুই দেশই নিজেদের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঘটনা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদেশি সংবাদপত্রে এ ধরনের বিরূপ প্রচার করা হয়েছে। এটি ভারতের পক্ষে মানহানিকর এবং যাঁরা সত্য জনতে চান তাঁদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করা জরুরি। ভারত সরকার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য— এই দুই পর্যায়েই শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে— অবশ্যই পঞ্জাব এবং দিল্লির অবস্থা ঠাণ্ডা হবার পরে। এর মধ্যে পাকিস্তান কিন্তু সিন্ধু এবং পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের শান্তিতে থাকবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে— এটি একটি গুরুতর এবং অবিরাম প্ররোচনাও বটে। এটা ভুললে চলবে না যে যাঁরা পূর্ববঙ্গ বা সিন্ধুপ্রদেশ থেকে চলে এলেন তাঁরা কিন্তু দেশভাগের সময়কার কোনো কাল্পনিক ভয় থেকে এ কাজ করেননি। এঁরা পাকিস্তানে থেকে যেতে চেয়েছিলেন, শুধু যদি তাদের শান্তিতে এবং সুস্থিতিতে সে দেশে থাকতে দেওয়া হতো।

নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পর হাওড়া স্টেশনে শ্যামাপ্রসাদ (২০.৫.১৯৫০)

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে নতুন করে পূর্ববঙ্গে নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। সে অঞ্চলে একটা লৌহ যবনিকা টাঙানো ছিল, যার ফলে এর খবর প্রথম প্রথম ভারতে পৌঁছয়নি। ১৯৫০-এর জানুয়ারি মাসে যখন ১৫,০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হয় তখনই নির্যাতন ও ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনি জানা যায়। এবার আক্রমণ হয়েছিল যুগপৎ শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং গ্রামের সেই সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যারা সচল, চাঙ্গা এবং ঐক্যবদ্ধ। এদের বুকের অন্তস্তলে ভয় ধরিয়ে দেওয়াই ছিল পাকিস্তানের নীতি। এই ভয়ংকর খবরে পশ্চিমবঙ্গে তুলনামূলকভাবে কিছু ছোটোখাটো প্রতিক্রিয়া হয়। যদিও এসব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে দমন করা হয়েছিল, এই বিষয়ে মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত খবর পূর্ববঙ্গে প্রচার হতে থাকে। এই প্রচার পরিষ্কার সরকারি প্রচেষ্টায় হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভয়াবহ। দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে পূর্ববঙ্গে নারী নির্যাতন, নারীধর্ষণ, অসহায় মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরকরণ এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের এমন সব শোচনীয় ঘটনা সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটতে আরম্ভ করে যা কোনো সভ্য সরকারের কখনো সহ্য করা উচিত নয়। আমাদের কাছে যা খবর পৌঁছেছে তার ভিত্তিতে একথা বলা যায় এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। পূর্ববকে সংখ্যালঘুশূন্য করার এক ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনারই অঙ্গ এগুলি; এই কথা অস্বীকার করা মানে কঠিন সত্য ভুলে যাওয়া। এই সময় আমাদের নিজেদের প্রচারযন্ত্র কী দেশে, কী বিদেশে একেবারেই দুর্বল এবং অকর্মক অবস্থায় ছিল। যাতে ভারতের ভিতরে প্রতিক্রিয়া না হয় সেটাই আংশিকভাবে এর কারণ। কিন্তু পাকিস্তান সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থান নিয়েছিল। এর ফল হলো, ভারত আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হলো— যদিও বাস্তব তার ঠিক উল্টো। সেই কঠিন সময়ে যদিও কিছু উত্তেজিত মানুষ ছিলেন, বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু চাইছিলেন যে ভারত সরকার এই বিষয়ে যথযথ ব্যবস্থা নিক এবং পাকিস্তান পৈশাচিকতা বন্ধ করুক। সেই সময় কিন্তু আমরা তাদের হতাশ করলাম। যখন একদিন— এমনকী এক ঘণ্টা সময়ও গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ নষ্ট করেছি অব্যবস্থিতচিত্ত অবস্থায়। পুরো দেশ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আমাদের কাছ থেকে কিছু কাজ আশা করছিল তখন আমরা শুধু বসে বসে সময় কাটিয়েছি, কী করতে হবে ঠিক করতে পারিনি। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের আরও কিছু জায়গায় মানুষ ধৈর্য হারাতে আরম্ভ করল এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করল। আমি এ কথা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, পাকিস্তানে যে পৈশাচিকতা হচ্ছিল তাঁর প্রতিবাদে ভারতে কিছু নির্দোষ মানুষকে হত্যা কোনো সমাধান হতে পারে না। এর ফলে যে চক্র তৈরি হয় তা আরও ভয়ংকর; এতে মানুষের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় এবং এমন সব অপশক্তির উদ্ভব ঘটে যাকে পরে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা একটি সভ্য রাষ্ট্র, আমাদের সেরকম আচরণই করতে হবে এবং রাষ্ট্রের সব নাগরিক যাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রাখেন তাঁদের সকলকে ধর্মনির্বিশেষে নিরাপত্তা দিতে হবে। এরকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হয় এবং সরকার যদি যথেষ্ট তৎপর হয় এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গত চাহিদা মাথায় রেখে এগোয় তবে নিঃসন্দেহে সব মানুষই সরকারের সপক্ষে এসে দাঁড়াবে। সরকার অবশ্য দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে সফল। এর মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গের, যারা জীবিকার সন্ধানে ভারতে ঢুকেছিল। এইবার পাকিস্তান অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল, কারণ উদ্বাস্তু আগমনটা আর একমুখী থাকল না। গত জানুয়ারি মাস থেকে অন্তত দশ লক্ষ মানুষ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। অনেকে ত্রিপুরা ও অসমেও গেছেন। যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে হাজার হাজার মানুষ ভারতে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে সব শ্রেণীর ও সব অবস্থার মানুষই আছেন।

অতএব আজকে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তানে কি সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাবোধ নিয়ে থাকতে পারবে? চুক্তি করে কোনো লাভ হলো কিনা সেটার পরিচয় ভারতে বা বিদেশে চুক্তির প্রতি

প্রতিক্রিয়া নয়— সেটার পরিচয় পাকিস্তানের হতভাগ্য সংখ্যালঘুদের অথবা যারা এর মধ্যেই ভারতে চলে এসেছেন তাঁদের মানসিক অবস্থা। পাকিস্তানে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কী ভাবলেন বা কিছু করতে চাইলেন কিনা সেটা এক্ষেত্রে অবান্তর। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র, সরকারি কর্মচারীদের মানসিকতা, সাধারণ মানুষের মনোভাব এবং আনসার সদৃশ সংগঠনের কীর্তি, এসব মিলে সেদেশে হিন্দুদের বেঁচে থাকাকেই দুর্বিষহ করে তুলেছে। এমনও হতে পারে যে কয়েকমাস ধরে কোনো বড়োরকম অত্যাচারের ঘটনা ঘটল না। এর মধ্যে আমরা মহা উদার হয়ে পাকিস্তানের যা যা প্রয়োজন সব দিয়ে দিলাম, ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটল। পাকিস্তান এই কায়দা অবলম্বন করেই চলেছে। হয়তো পরবর্তী আক্রমণ আসবে বর্ষাকালে, যখন যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

এই চুক্তির অংশীদার হতে আমি রাজি নই। তার প্রধান কারণগুলি আমি এইবার বলছি।

প্রথমত— দেশভাগ হবার পরে এরকম দুটি চুক্তি হয়েছে এবং পাকিস্তান দুটিরই খেলাপ করেছে, যার কোনো প্রতিকারের রাস্তা আমাদের কাছে ছিল না। যে চুক্তিতে এরকম ব্যবস্থা নেই তা করে কোনো লাভ হবে না।

দ্বিতীয়ত— সমস্যার মূল নিহিত আছে পাকিস্তানের 'ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণায় এবং তার উপর ভিত্তিকৃত এক প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক প্রশাসনের মধ্যে। চুক্তি এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে এবং ফলে আমরা চুক্তির আগে যেখানে ছিলাম সেইখানেই থেকে গেছি।

তৃতীয়ত— দেখে মনে হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান দুয়েরই সমান দোষ। বাস্তবে তো পাকিস্তানই আক্রমণকারী। চুক্তিতে লেখা আছে, দুই দেশের রাষ্ট্রীক নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনো প্রচার বরদাস্ত করা হবে না, এবং কেনো যুদ্ধে প্ররোচনাও দেওয়া হবে না। এটা হাস্যকর— কারণ এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমাদের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের একটা অংশ দখল করে আছে এবং সেখানে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

চতুর্থত— ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে পাকিস্তানের দেওয়া নিরাপত্তার আশ্বাসবাণীর ভিত্তিতে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকতে পারবে না। এটাকে একটা মূল ভিত্তি হিসেবে মেনে নেওয় উচিত। অপরপক্ষে এই চুক্তিতে বলা হচ্ছে যে সংখ্যালঘুরা তাদের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপরেই নির্ভর করে থাকবে। এটা আঘাতের পর অপমানের মতো। অতীতে তাদের যা আশ্বাস আমরা দিয়েছি এটা তারও বিরোধী।

পঞ্চমত— যাদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেবার কোনো কথা চুক্তিতে নেই। যারা দোষী তাদের কোনোদিন কোনো সাজাও হবে না, কারণ কোনো কথা চুক্তিতে নেই। যারা দোষী তাদের কোনোদিন কোনো সাজাও হবে না, কারণ কোনো পাকিস্তানি আদালতে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার সাহাস কারুর হবে না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতকা তাই-ই বলে।

ষষ্ঠত— হিন্দুরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতেই থাকবে। যারা এর মধ্যেই চলে এসেছে তারাও ফিরে যাবে না। কিন্তু মুসলমান যারা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তার এইবার ফিরে আসবে, এবং আমাদের চুক্তি রূপায়ণ করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা দেখে আর কোনো মুসলমান ভারত ছেড়ে যাবে না। এর ফলে আমাদের অর্থনীতি প্রচণ্ডরকম ঘা খাবে এবং দেশের ভিতরে সংঘাতের সম্ভাবনাও বাড়বে।

সপ্তমত— ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবার ছলে এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের যে সমস্যা ছিল তাকে আবার মদত দেওয়া হলো। এর ফলে সেইসব রাষ্ট্ররোধী শক্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হলো যাদের চেষ্টায় পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। এই নীতি যদি শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এর ফলে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হবে যা আমাদের সংবিধানেরই বিরোধী।

বিকল্প কোনো উপায় বা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করার সময় বা সুযোগ কোনোটই এখন নেই। সরকরের অনুসৃত নীতির ফলাফল দেখেই সেসব সম্বন্ধে ভাবা যবে। যাঁরা এই চুক্তি করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না। আমি কেবল আশা করব যে এই চুক্তি শুধু একতরফাভাবে পালিত হবে না। যদি এই চুক্তি সফলকাম হয় তা হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউই হবে না। আর যদি চুক্তি ব্যর্থ হয় তাহলে এটি হবে একটি বিয়োগান্ত পরীক্ষা, যার জন্য দেশকে অনেক দাম দিতে হবে। শুধু আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করব, যাঁরা এই চুক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা যেন নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন এবং পূর্ববাঙ্গলা ভ্রমণ করেন। একা যাবেন না— নিজেদের স্ত্রী, বোন, মেয়েদের নিয়ে যাবেন এবং পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দু সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে বাস করে দেখাবেন, তাঁদের সমব্যথী হবেন। সেটাই তাঁদের বিশ্বাসের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হবে। এই সরকার এই আশ্বাস দিতে চাই যে এই মুহূর্তে ভারতের মধ্যে শান্তি, সুস্থিতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার ব্যাপারে আমি একমত। সরকারের উপর যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সরকর যথাযথভাবে এবং সময় থাকতে তোষণনীতির কুফলগুলি এড়াবার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে এবং কেনোরকম অত্যাচর না হয় তা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির কোনো প্রচেষ্টাকেই উৎসাহ দেওয়া যাবে না। সরকার আর একবার চেষ্টা করতে চাইছে, এটিই চেষ্টা করার শেষ সুযোগ, করুক চেষ্টা। কিন্তু সরকারকে যারা সমালোচনা করবে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য যেন কোনো চেষ্টা না হয়। আমদের দুর্ভাগ্য, চুক্তির একজন স্বাক্ষরকারী যারা বার বার চুক্তির খেলাপ করেছে, তারা যেন মুখে নয়, কাজে করে দেখায় যে তারা এই চুক্তি রূপায়ণ করতে পারে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে। এই সতর্কবাণীতে সরকারের বিচলিত হওয়া উচিত নয়, কারণ এর ফলে সরকার আরও সচেষ্ট এবং আরও সতর্ক হয়ে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।

উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপারে তাদের পুনর্বাসন— যা একটি বিরাট সমস্যা— তার কথাও ভাবতে হবে। ভাঙা বাঙ্গলায় পশ্চিমবঙ্গ একা এই ভার বহন করতে পারবে না। এটি এমন একটি সমস্যা যার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সবরকম প্রচেষ্টা নিতে হবে। সরকার এবং সরকারের সমালোচক এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই সহযোগিতা রাখতে হবে। তার কারণ, এই সমস্যা বহু লক্ষ মানুষের সুখশান্তি প্রদানের সমস্যা, এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমস্যা।

(সৌজন্য : যা ছিল আমার দেশ—তথাগত রায়)

নেতাজির সঙ্গে ভারতীয় ও জাপানের সামরিক অফিসররা।

মৈরাংয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪১ সালের ১৫ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র যখন গোপনে ভারত থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তখন তাঁর অন্তরে দেশকে ইংরেজ মুক্ত করার তীব্র আবেগের সঙ্গে বহমান ছিল ইতিহাস-বিরল এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিকল্পনার ভাবনা।

বিচিত্র ছদ্মবেশে ২৮ মার্চ বার্লিন পৌছনোর পর তিনি তার যুদ্ধ পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পথে মানসিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন একথা সকলেরই জানা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন জোর কদমে। পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপান অক্ষশক্তির অংশ হিসেবে ইংরেজদের সঙ্গে কঠিন লড়াই করছে। জার্মানিতে নেতাজী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সৈন্যদের (যে সব ভারতীয় ব্রিটিশের হয়ে সারা বিশ্বে যুদ্ধ করতে বাধ্য হতো) একটা বড়ো অংশকে জার্মানির হাতে বন্দি অবস্থায় দেখেন। এরা ছিল অফ্রিকা ফ্রন্টের দুধর্ষ জেনারেল রোমেলের হাতে ধরা পড়া সৈন্য। জার্মানিতে অবস্থানের সময় চার হাজারের মতো যুদ্ধবন্দিকে নিয়ে তিনি ইন্ডিয়ান লিগ গঠন করেন যারা অদুর ভবিষ্যতে হিটলারের সৈন্যদের সহকারী হয়ে ভারত আক্রমণ করবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আফ্রিকায় হিটলারের ফৌজ নাজেহাল হতে থাকে। পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। অন্যদিকে আর এক দুর্জয় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস নানা ছদ্মবেশে জাপানে পৌঁছে জাপানের কাছে পরাজিত-ইংরেজ ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তাঁর ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুরে প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা সকলেরই জানা। অক্ষ শক্তির হয়ে জাপান একের পর এক সিঙ্গাপুর, মালেসিয়া, বার্মায় ইংরেজ সৈন্যকে পরাজিত করায় বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ সেনাবাহিনিতে নিযুক্ত ভারতীয় সেনারাও যুদ্ধবন্দি হয়ে যাবার অপমান ভুলতে নতুনভাবে আইএনএ সৈনিকের পোশাক ধারণ করছে। এই সময়েই রাসবিহারীর অনুরোধে জাপান সরকার হিটলারের কাছে নেতাজীকে জাপানে পাঠাবার আবেদন করে। এ খবর পাওয়ার পরই নেতাজী হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন। আজীবন বর্ণবিদ্বেষী (১৯৩৬ এর বার্লিন অলিম্পিকে সর্বাধিক পদকজয়ী জেমি ওয়েনমের সঙ্গে করমর্দন করেননি কালো হওয়ার কারণে) প্রথমে রাজি না হলেও পূর্ব এশিয়ায় জাপানি সাফল্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় তিনি একবারই সুভাষের সঙ্গে দেখা করে জাপানে যাওয়ার একটি সাবমেরিন ও চালকের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যের এই বন্দুক ঘুরিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যে একদিন সম্ভব হতে পারে একথা দামোদর বিনায়ক সাভারকরের মতো দুর্জয় ব্যক্তি দেশপ্রেমী সুভাষকে আগেই বলেছিলেন। ইংরেজ কবলিত সেই সমগ্র সমুদ্রপথে বিপদসঙ্কুল সাবমেরিন যাত্রার কথাও সুবিদিত, অবশ্য এই জার্মান সাবমেরিন মাঝে মধ্যে ভেসে উঠত। এমনই একটি দিনে তিনি তাঁর সুদুর মাতৃভুমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলেন 'জয় হিন্দ'। দেশকে অভিবাদন মন্ত্রের সেই ছিল জন্মক্ষণ।। জাপান পৌঁছে INA-এর ভার তুলে নিয়ে এক উজ্জীবিত ভারতীয় ফৌজ তৈরির কাজে হাত দিলেন তিনি। ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ ঘোষিত হয়ে গেল আজাদ হিন্দের প্রভিন্সিয়াল সরকার (আর্জি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ)। জার্মানি, ইটালি, জাপান প্রভৃতি অক্ষশক্তি ভুক্ত দেশগুলি ও অন্যান্য আরও ৭টি দেশ সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানায়। তাহলে সেনা তৈরি, নেতা তৈরি, দেশপ্রেমের শিখা বহ্নিমান, শুধু নেই স্বাধীন দেশের কোনো নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড। জাতির প্রধানতম শর্ত হিসেবে State as a concept of political scienes & constitutional law in a community of persons .... parmanently occupying a definite

position of territory। এই ভূমিখণ্ড অর্জন স্বাধীন দেশ হয়ে ওঠার আবশ্যিক শর্ত। ১১৪২ এর জানুয়ারিতে জার্মানি, জাপান, ইটালি পারস্পরিক যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাতে ইয়রোপ ও আফ্রিকার বিজিত অঞ্চলগুলি তাদের অধিকারে থাকবে। পূর্ব দিকের অর্থাৎ এশীয় অঞ্চল থাকবে জাপানের আওতায়। এই সূত্রে যে আন্তর্জাতিক বিভাজনরেখা টানা হয় তাতে জাপান ইতিমধ্যেই পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বহু দেশ অধিকার করে নিয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে একাত্মতা ও তাকে পূর্ণ মান্যতা দিতে জাপানি প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল হিদেকি তোজো ৬ই এপ্রিল ১১৪৩ এর ইস্ট এশিয়া কনফারেন্সে বিজিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাজও সেই মতো হয়। নেতাজী আন্দামান পরিদর্শন করে দ্বীপ দুটির নাম শহিদ ও স্বরাজ বলে চিহ্নিত করেন। শর্ত পুরণ হয়ে গেল স্বাধীন দেশের। ভূমি এসে গেল অধিকারে। ঠিক আছে, বড় লড়াই সামনে প্রত্যাখান করেননি তিনি। কিন্তু বললেন আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানি সেনার সঙ্গে কাধে কাঁধ মিলিয়ে ভারত ভূমির জলে জঙ্গলে লড়ে ইংরেজদের পরাজিত করেই স্বাধীন দেশের মর্যাদা চায়। নেতাজী বলেছিলেন INA should be the first to shed its blood on the soil of India. সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণে প্রকাশ করলেন তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ''The future greatness of Indians who will be born, not as slaves but treemen because of your colossal sacrifice..... the darkest hour always preceds the dawn. India shall be free & before long.''

বলা দরকার সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, বার্মা জয় করার সময় সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনের পথে ফৌজের রণধ্বনি ছিল 'রেঙ্গুন চল, রেঙ্গুন চল'। এইবার আইএনএ এবং জাপানি ফৌজের মুখে এল সেই বিখ্যাত 'চলো দিল্লি, চলো দিল্লি'।

শুরু হল বার্মা থেকে কোহিমা, ইম্ফল হয়ে মৈরাং অভিযান। নেতাজী জাপানের সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে অভিযান শুরুর আগেই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন ''The first flag planted on the Indian soil would be tricolour & the first bloodshed on the liberated area would be that of Indians.'' —ঠিক সেই জায়গায় পতাকা আজও উড্ডীন আছে।

ভারতবর্ষের যে প্রান্ত দিয়ে নেতাজীকে ঢুকতে হতো তা সেই ৭৫ বছর আগে আক্ষরিক অর্থেই ছিল পর্বত, পাহাড়, জল, জঙ্গলের প্রাকৃতিক লীলাভূমি। জাপানি ট্যাঙ্ক বা কামান ছাড়া তাঁর সৈন্যের লড়াই করা সম্ভব ছিল না, তাই জাপান যে পথে চলেছে সেই ছিন্দউইন নদী পেরিয়েই ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার। আইএনএ-র মৈরাং ফ্রন্টের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এইচ. সি. শোভার লেখা থেকে জানা যায় ১৫ই মার্চ ইন্দো-বার্মা সীমান্ত পেরিয়ে বাহিনী ১৯ তারিখে উমরূল আক্রমণ করে। ৩১ তম জাপানি ডিভিসন ও INA বাহিনী উমরূল অধিকার করেই ২১শে মার্চ কোহিমা অবরোধ করে। ২১শে মার্চ INA এর একটি রেজিমেন্ট ছিন্দউইন নদীর আর একটি দিক থেকে ঢুকে কোহিমা ইম্ফল রোড বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু এই লড়াইয়ে INA ও জাপ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জঙ্গলের পথে বহু ভারতীয় সৈন্য আটকে পড়ে। ইংরেজ সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ শানায় অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন বোমারু বিমান পাঠান। ইতিহাসের এ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ইম্ফলে গুরুত্বপূর্ণ বার্মা টিডিস রোড অধিকার করার পর শিলচরের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা বিষেনপুরেই আটকে যায়। ১৩ই এপ্রিল INA ও জাপ বাহিনী ইম্ফল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দুরে প্রাচীন এই 'মৈরাং কাংলা' জনপদ সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। নেতাজীর আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন সফল করে ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৪ এর এক রক্তাক্ত অপরাহ্নে আজাদ হিন্দ ফৌজের সুভাষ ব্রিগেডের কর্নেল সৌকত আলি মালিক মৈরাংয়ের এই ভূমিকে চিরস্মরণীয় করে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তোলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে জানালেন সেই সময়ে কর্নেল মালিকের সঙ্গে থাকা সাগবা সিংহ, কাংলেন সিংহ, কেলিরেন সিংহ প্রমুখের পরিবারের পরবর্তী সদস্যরা।

বর্তমানে মৈরাংয়ে একটি ত্রিস্তর সংরক্ষণাগার নির্মিত হয়েছে। প্রথমটি INA War Musium. এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত বেয়োনেট, গোলা, হেলমেট, পিস্তল, আমেরিকান ট্যাঙ্কের দরজা, হাত বোমা, জাপানি রাইফেল রয়েছে। রয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি। নেতাজীর নিজের হাতে স্বাক্ষর করা Circular। এই মৈরাংয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম প্রধান কার্যালয়। যে বাড়িতে দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল বেশ কিছু বুলেটের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে তা আজও বিদ্যমান। তবে সংগ্রহালয় বা বাড়ি কোনো কিছুরই ছবি তোলা বারণ বলে সেটি করা যায়নি। হ্যাঁ, মিউজিয়ামে রয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন সামরিক মর্যাদার ফলক। আজাদ হিন্দের যুদ্ধে যাওয়ার আদেশনামা। এগুলি দেখলে অনুভূতিতে হঠাৎ যে ফারাক টের পাওয়া যায় সেগুলি লিখে বোঝানো অবান্তর।

সবচেয়ে বড় কথা, আজাদ হিন্দ ফৌজের এই সরকার ছিল সব দিক দিয়ে সংগঠিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত ও নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বে ভাগ করা। যে সরকারের প্রথম কর্তব্য ছিল দেশ থেকে বিদেশি ইংরেজকে উৎখাত করা। সরকারের ছিল নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা ১০ হাজার টাকা মানের নোট পর্যন্ত বাজারে ছিল। কিছু জাপানি নোটও চলত। আজাদ হিন্দ সরকার তখনকার মূল্যমান ১, ৩, ৮ ও ১২ আনা দামের পোস্টেজ স্ট্যাম্পও চালু করে। এগুলি সবই মিউজিয়ামে দেখা যাবে। সরকারের অধীনে ছিল ৫০ বর্গমাইল এলাকা। জনসংখ্যা ছিল ১৫০০০। মণিপুর ও বিষ্ণুপুরের অঞ্চলই ছিল সরকারের অধীনে। যুদ্ধে জাপানের অবস্থার অবনতি ও ইংরেজদের তুমুল আক্রমণের মুখে ৩ মাসের বেশি এই প্রথম ভারতীয় স্বাধীন সরকার টিকে থাকতে পারেনি। তবে এমন দুর্গম পথে এই সফল অভ্যুত্থানে ইংরেজের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল। ত্বরান্বিত হয়েছিল ভারতীয় স্বাধীনতা। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিতে নির্মিত ইত্তেফাফ, ইত্তেমাদ, কুরবানি সমেত প্রথম ফলকটি প্রথমে ব্রিটিশরা পুনর্দখলের পর ধ্বংস করলেও পরবর্তী ভারত সরকার সেটি পুনর্নির্মাণ করেই নেতাজীর প্রতি দায় রক্ষা করেছে। জাতির এমন পুণ্যতীর্থের আরও প্রচার দেশের স্বার্থেই কাম্য। ■

চিঠিপত্র

অসহিষ্ণুতা-হিংসা-দ্বিচারিতা

মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়ের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পত্রবোমার বিষয়ে আমি একমত হলেও কিছু বলতে চাই। প্রথমত, বুদ্ধিজীবী শব্দ প্রয়োগে আমার আপত্তি আছে, কারণ বুদ্ধিজীবী বলতে আমি বিদ্বজ্জন বুঝি যাঁরা সৎ ও নিরপেক্ষ এবং যাদের মতামত দেশ ও দেশবাসীর উন্নয়নে গুরুত্ব পায়। কিন্তু বাংলাদেশে নির্যাতিত ও নির্যাতিতাদের পাশে যারা দাঁড়ান না এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া ভূষণের ভাণ্ডারে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে ও হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করে প্রচারের আলোয় থাকতে সদা তৎপর এই সব রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বিশিষ্টজনের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি দেশের সার্বভৌমত্ব ও একতা নষ্ট করে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে। এঁদের ধিক্কার জানাতে সমগ্র ভারতবাসীকে অনুরোধ করছি। এঁদের অনেকে নিজেদের তৃণমূলি বলে দাবি করেন যদিও এঁরা বাম শাসনকালে নিজেদের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে জাহির করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, 'আল্লাহু অকবর' যুদ্ধের ধ্বনি হলেও 'জয় শ্রীরাম' কখনই যুদ্ধের ধ্বনি নয়। 'জয় শ্রীরাম' বলে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হয়েছিলেন। ভয় পেলে রাম নামে ভয় দূর হয়। ব্যবসায়ীরা তো দ্রব্যের ওজন শুরু করেন রাম নামে। এমনকী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুকালেও 'হে রাম' শব্দই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল। আর পশ্চিমবঙ্গে রাম নামে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, জেল হচ্ছে, এমনকী মরতেও হচ্ছে। স্বভবতই দ্বিচারিতায় লিপ্ত পত্র লেখকদের কাছে জানতে ইচ্ছা করে— এঁরা নিজেদের শবযাত্রায় রাম নামের পরিবর্তে কী ধ্বনি উচ্চারিত হবে সেট নিজেদের পরিজনকে জানিয়েছেন কি? আমার বিশ্বাস জানাননি।

—ডাঃ মদনলাল চৌধুরী,
নলহাটি, বীরভূম।

এ খেলা চলছে নিরন্তর

সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ৪৯ জন বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রীকে পত্র পাঠিয়েছেন ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সহিষ্ণুতার কারণে দেশ ভাগ, কাশ্মীর সমস্যা, পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসা এটা চলেছে, চলছে, চলবে।

সহিষ্ণু মানুষগুলো ধর্মান্তরিত হলেন এবং অসহিষ্ণুর দলে নাম লেখালেন, ফলেই এই পরিণতি। সহিষ্ণু মানুষগুলো দেওয়াল লিখন পড়তে জানেন না অথবা জেগে ঘুমান। স্রোতের অনুকূলে থাকলে মানুষের হাততালি পাওয়া যাবে, পরিশ্রম করতে হবে না। এরা জানেন তাঁদের তো গ্রামে থাকতে হয় না, জমি চাষ করতে হয় না, মিলে মিশে থাকতে হয় না, তাঁদের একটি মাত্র সন্তান আছে, বেশি সহিষ্ণুতার জায়গায় ফ্ল্যাট অথবা বাড়ি তৈরি আছে। চিন্তার কী আছে, আবার পালাবো—সেখানে গিয়ে সেকুলারে চাষ করবো। দেওয়াল লিখন পড়ব না—পড়তে দেবও না। বর্তমানে বাজারি পত্রিকাগুলো এই দেওয়াল লিখন পড়তে না দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই এগিয়ে থাকে এবং এগিয়ে রাখে। কিছু মানুষ ভাবে চোখ বুজে থাকলেই হলো, এখন তো কোনো সমস্যা নেই— পরে ব্যাপারটা দেখা যাবে।

—অসিত কুমার দত্ত,
বহিরগাছি, নদীয়া।

নব নির্মাণের পথে ভারত

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল সাফল্য তাঁদেরকে এক বিরাট দায়িত্ব দিয়েছে। যে দায়িত্ব হলো দেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বৈদেশিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে খোলনলচে সংস্কার। স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশক কংগ্রেসের কাছে সুযোগ ছিল, ইংরেজ প্রবর্তিত দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অপদ্রব্য দূর করে, বিশুদ্ধ ভারতীয় করে তোলা, কিন্তু তারা সেই পথে এগোয়নি, তাঁরা একটা পরিবারকে মাথার উপর বসিয়ে, ধর্ম আর জাতপাতের পাটিগণিত দিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতার অলিন্দে টিকে থাকতে চেয়েছে। দেরিতে হলেও এদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটছে এবং তা ঘটেছে যুব প্রজন্মের হাত ধরে। তাই দেশের যুব সম্প্রদায় যারা বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তাঁদের সকল প্রত্যাশা পূরণের দায়ভার ভারতীয় জনতা পার্টিকে যে নিতে হবে, একথা অনস্বীকার্য। এখনকার যুব সম্প্রদায় ভারতকে ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থার উপজাত একটি দেশ হিসাবে দেখতে চায় না। তারা চায় বিশুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতার উপর দাঁড়িয়ে, ভারতীয় মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র। তার জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর খোলনলচে পরিবর্তন।

প্রথমেই ধরা যাক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা। ইংরেজরা চলে যাওয়ার ৭২ বছর পরেও আমরা আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ছত্রে ছত্রে তাঁদের ছায়া বহন করে চলেছি, এখনও জেলাশাকদের বলা হয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর। এখনও কি জেলার সকল দেওয়ানি মামলা জেলাশাসকের এজলাসে আসে নাকি এখনও জমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব জেলাশাসক সংগ্রহ করেন? আজকের পরিবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একজন জেলাশাসকের ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতার কোনও অস্তিত্ব আছে না তাঁর রাজস্ব সংগ্রহের কোনও দায়িত্বভার আছে। এখনকার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একজন জেলাশাসক হলেন তাঁর জেলার সকল রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রকল্পের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। সুতরাং পরিভাষাগত ভাবে তার পদের নাম হওয়া উচিত জেলা মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক বা ওই জাতীয় কিছু। এ তো গেল পদের পরিভাষার প্রশ্ন এবার আসা যাক রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে এই আধিকারিকদের চয়ন প্রক্রিয়ায়। সেখানেও ছত্রে ছত্রে ইংরেজ প্রভাব স্পষ্ট। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার অন্তর্ভুক্ত সকল পদের চয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় লোক

সেবা আয়োগ এবং রাজ্য স্তরে সেটি করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের লোক সেবা আয়োগ।

দুটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল কাঠামোটা সেই ইংরেজ প্রবর্তিত। ১৮৫৭-র পরে মাকাউলি কমিটির সুপারিশ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা চালু হয়, প্রথমে শুধুমাত্র লন্ডনে পরীক্ষা হতো, পরে লন্ডন ও ভারতে দুই স্থানে পরীক্ষা চালু হয়। সেই পরীক্ষাটি হতো মূলত ১৯০০ নম্বরের, ১৮ থেকে ২৩ বছরের যুবকেরা মোট তিন বার সুযোগ পেতো। এখন কেন্দ্রীয় স্তরে যে পরীক্ষাটি হয় তার মূল পর্বে মোট ১৭৫০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে ভিরাপ্পা মইলির নেতৃত্বে যে দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেখানে কেন্দ্রীয় স্তরে এই প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বয়েসের ঊর্ধ্বসীমা আবার কমিয়ে ইংরেজদের সময়ে মতো ২৩ থেকে ২৬ করার সুপারিশ করা হয়েছে। মূল পরীক্ষার যা বিষয় তা সময় সময় কিছু পরিবর্তন করলেও মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশ বিদ্যার সঙ্গে একটি ঐচ্ছিক বিষয়কে জুড়ে দিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করার প্রথা স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসছে। একজন জেলাশাসক বা একজন জেলা পুলিশ আধিকারিক পদে যিনি দায়িত্ব নেবেন তিনি শুধুমাত্র নম্বর পাওয়ার জন্য নৃতত্ত্ববিদ্যা কিংবা দর্শনের মতো বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের পড়াশোনা করে কেন অযথা সময় নষ্ট করবেন? আর ভবিষ্যতে যারা অপ্রচলিত শক্তি, কিংবা কৃষি আধুনিকীকরণ, কিংবা সড়ক পরিবহণ কিংবা সামরিক প্রযুক্তিতে দেশকে আগে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পাবেন তারা দর্শন বা নৃতত্ত্ব পড়ে কী করবেন? আগের বার মোদী সরকার পরীক্ষা ব্যবস্থাকে এড়িয়ে কিছু উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সরাসরি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকে যুগ্ম সচিবের পদে নিয়োগ করেছেন তা একবারে সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। তা নিয়ে বিরোধী দলগুলো যাই বলুক, এই পথে আগামীদিনে আরও অগ্রসর হতে হবে। আইএএস পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার, ঐচ্ছিক বিষয়কে বাদ দিয়ে সময়োপযোগী বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নাতিদীর্ঘ পরীক্ষা সূচি করতে হবে এবং এই পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মূল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, তাঁদের এমন কোনও প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসানো যাবে না যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি কিংবা বিশ্বমানের পেশাদারিত্ব প্রয়োজন।

—সোমনাথ গোস্বামী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সত্যি কথায় সবারই রাগ হয়

সত্যি কথা শুনলে সকলেরই গায়ে জ্বালা ধরে, কিন্তু ব্যথিত যদি সত্যি কথা না বলে তার তো আক্ষেপ থেকেই যায়। বাংলাদেশের হিন্দু ঐক্য জোটের সম্পাদিকা প্রিয়া সাহা তো ঠিক কথাই বলেছেন। বাংলাদেশে প্রায় পৌনে চার কোটি লোক মিসিং, কিন্তু আমার তো মনে হয় উনি একটু কম বলেছেন। আমরা আশেপাশে লোককে জিজ্ঞাসা করে যে তথ্য পাই তাতে কেউ-ই বলে না তারা এদেশীয়, তারা ওপার থেকে এসেছে। কোনো ব্যক্তি যদি বলে তার জন্ম এদেশে কিন্তু তার বাবা-মা অবশ্যই পাকিস্তান বা বাংলাদেশীয়। খবরে প্রকাশ জ্যোতি বসু থেকে বিপ্লববাবু, মানিক সরকার, এমনকী মমতা ব্যানার্জিরও পূর্বপুরুষ বাংলাদেশ থেকে এসেছে। কিন্তু এরা ভারতে এসে সবাই ভুলে গেছে বাংলাদেশে হিন্দুদের। এখানকার অনেক নেতা-নেত্রী বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য কোনো আক্ষেপ প্রকাশ করেন না।

হিন্দুদের বিনাশকালে এদের মুখে সেলোটেপ লাগানো থাকে। শুধুই এদের ভোটপাখির চোখ একটি সম্প্রদায়ের ওপর। ওই সম্প্রদায়কে নিয়ে এরা এতই ব্যস্ত অন্যদের চোখে দেখে না। হিন্দু এদেশে ওদেশে সর্বস্তরে অবহেলিত। এদেশে একটি সম্প্রদায়ের ভোটের জন্য ওদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার খবরে তারা মুখ বন্ধ করে রাখেন। এবার দেখা যাক প্রিয়া সাহার কপালে কী দুর্ভোগ আছে। ও দেশের সরকার প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছে। এখন এর কপালে সুরেন্দ্রনাথ সিনহা এবং পলাশ রায়ের মতো শাস্তি না জোটে সেটাই এখন দেখার।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

উত্তর চন্দরনগর ফেরত চাই

হাজার হাজার বছরের শহর চন্দরনগর (চন্দননগর)। গঙ্গার কূল বরাবর বৃহৎ চন্দরনগরের উত্তর সীমা হচ্ছে তোলাফটক এবং দক্ষিণ সীমা হচ্ছে রামপুর তথা শ্রীরামপুরের উত্তর সীমা। ১৭৫৫ সালেও বৃহৎ চন্দরনগরের ইজারাদার ছিলেন বিখ্যাত চৌধুরী বংশের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১৬৬০ সালের ডাচ মানচিত্রে চন্দরনগর নামটি আছে, চন্দননগর নাম নেই। ১৬৯০ সালের ফরাসি রেকর্ডে চন্দননগর-চন্দ্রোনগর নামদ্বয় খারিজ হয়ে 'চন্দরনগর' নামটি বহাল। ফরাসি ও ইংরেজদের বিবাদের কথা সকলেরই জানা। ইংরেজ কোম্পানি বাঙ্গলা ও বিহারের দেওয়ানি লাভ করার পরে একটি চুক্তির মাধ্যমে ফরাসিরা আবার চন্দরনগরে ফিরে আসে। ফরাসিরা ওই চুক্তিতে যে ভূমিটুকু পেয়েছিল তার তিন দিকেই পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে গড় খনন করে। ওই সময়ে হরিদ্রাডাঙ্গার পূর্বসীমা থেকে গড়টি চলে যায় সরাসরি তোলাফটক পর্যন্ত যা এখনও বর্তমান। তোলাফটকে আজও ফরাসিদের পোতা বাঁশ (স্তম্ভ) আছে। এর কয়েক বছর পরেই ডাচদের সঙ্গে ফরাসিদের কাজিয়া হয়। সুযোগ বুঝে ইংরেজরা বহির্ভারতের মশলাদ্বীপের বিনিময়ে ডাচদের কাছ থেকে চুঁচুড়া লাভ করে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ফরাসিদের থেকে উত্তর চন্দরনগর অংশটি কেড়ে নেয়। এর ফলে ফরাসিরা তেলাফটক থেকে সরে এসে নতুন করে ফটক স্থাপন করে তালডাঙ্গা তেমাথাতে। এখন কথা হচ্ছে, উত্তর চন্দরনগর মূল চন্দরনগরেরই অংশ। হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার কাছে আবেদন, অযথা অন্য শহরের ভূমি দখল করে রাখার কী দরকার যখন ফরাসি-ইংরেজ-ডাচেরা এ দেশেই নেই। চন্দরনগর পৌরনিগমের হাতে উত্তর চন্দরনগর ভূমি খণ্ডটি ফিরিয়ে দিলে ক্ষতি কী?

—মৃণাল হোড়,
চন্দনগর, হুগলী।

স্বাধীনতা, ভারতভাগ ও শ্যামাপ্রসাদ

বিমল শঙ্কর নন্দ

১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে সেই কুখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাবে বলা হলো যে ভৌগোলিকভাবে সন্নিবিষ্ট এককগুলিকে চিহ্নিত করে এবং প্রয়োজনে পুনর্গঠন করে যে অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (যেমন ভারতে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল) সেইসব অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ গঠন করতে। লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ভারতের ইতিহাসের গতিপথকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। কারণ জিন্নার কুখ্যাত দ্বিজাতিতত্ত্বকে সামনে রেখে মুসলিম লিগ এবার মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমি অর্জনের পথে অগ্রসর হবে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর সেই পথ যে শান্তিপূর্ণ, অহিংস পথ হবে না এর আগের কয়েকটি দশকের ঘটনাপ্রবাহে তার প্রমাণ ছিল। আর মুসলিম লিগের এই উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করতে যে সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং রাজনৈতিক কৌশলের প্রয়োজন ছিল তা তৎকালীন ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কতখানি আছে সে নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। উপরন্তু একটি ঐক্যবদ্ধ দেশকে ভেঙে ধর্মের ভিত্তিতে নতুন একটি দেশ গড়ে উঠলে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফল যে মারাত্মক হতে পারে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্বের সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল কিনা সন্দেহ। তবে অনাগত ভবিষ্যৎটি যে ভয়ংকর হতে পারে তা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুসলিম লিগের আচরণ কেমন হতে পারে, বিশেষত বঙ্গপ্রদেশে, সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা ছিল শ্যামাপ্রসাদের। মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাব পাশের ঠিক ১৩ দিন পরে ১৯৪০ সালের ৬ ও ৭ এপ্রিল সিলেটে অনুষ্ঠিত সুর্মাভ্যালি ও শিলং পার্বত্য জেলা হিন্দু কনফারেন্সে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, ''আমাদের সামনে এখন বিপদ অনেক, একেবারে সাম্প্রতিকতম বিপদটি হলো পাকিস্তানের দাবিতে আন্দোলন যাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। যারা হিন্দুস্থানকে ভালোবাসে তাদের সকলের উচিত এই অযৌক্তিক দাবিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা।'' শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘ দু' দশক ধরে কংগ্রেস রাজনীতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। মুসলমানদের বিভিন্ন দাবির প্রতি কংগ্রেসের দুর্বলতার কথাও তিনি জানতেন। তাই সেই একই কনফারেন্সে কংগ্রেসকে সতর্ক করে দিয়ে

শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, ''বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তার ছাতার তলায় এনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তিকে মজবুত করার যে নীতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তা আশাপ্রদ ফলদানে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলে যে আমরা সত্যিই অন্য সম্প্রদায়কে খুশি রাখার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের অধিকার ও স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছি, আমরা যতই 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দেওয়ার নীতি অনুসরণ করছি ততই আমরা দেখছি যে অন্য দিক থেকে যে সাড়া পাচ্ছি তা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।'' তিনি আরও বলেন, ''মনে হচ্ছে এখনো অনেকেই সেই ভাবনায় মেতে আছেন যে যতক্ষণ না হিন্দু মুসলিম এবং অন্যান্যরা একটি একক রাজনৈতিক সংগঠনের ছাতার তলায় সমবেত হচ্ছেন ততক্ষণ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আশা দুরাশাই থেকে যাবে। এটা সত্যি যে এই লক্ষ্য যদি অর্জন করা যেতো তবে স্বাধীনতার প্রক্রিয়া অনেক সহজ হতো এবং ভারতের সমস্যাবলীর প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবও অনেকটাই বদলে যেতো। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই ঐক্য যদি অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে কি হিন্দুরা এমন সব চুক্তি করতেই থাকবে আর এমন সব শর্ত মানতেই থাকবে যা দেশে সর্বোচ্চ স্বার্থের হানিকারক এবং যা হিন্দুদের শক্তি এবং অবস্থানকে বরাবরের জন্য দুর্বল করে দেবে?''

প্রখর বাস্তববাদী শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রভাব ভারতের সমাজ এবং রাজনীতিকে বদলে দেবে। এই অভিঘাত সামলানোর জন্য প্রয়োজন ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানুষদের ব্যাপকভিত্তিক ঐক্য এবং শক্তিশালী জাতীয় নেতৃত্ব। কিন্তু তৎকালীন ভারতে এই দুইয়েরই যথেষ্ট অভাব ছিল। একদিকে লাহোর প্রস্তাব এবং জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব মুসলমানদের একটি বড়ো অংশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল, অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং সিদ্ধান্তহীনতা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল। দেশের মধ্যে বড়ো অংশের মানুষ তখন গান্ধীজীর দিকে তাকিয়ে ছিল। এ ব্যাপারে তিনি কী মতামত দেন তা জানতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজীর মত সবাইকে শুধু হতাশই করেনি, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। গান্ধীজী লাহোর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান তো করেনইনি, বরং মত দিয়েছিলেন যে মুসলমানরা যদি নিজেদের পৃথক জাতি হিসাবে মনে করে তবে তিনি আপত্তি করবেন না। তাঁর সম্পাদিত 'হরিজন' পত্রিকার ৬ এপ্রিল, ১৯৪০ সংখ্যায় তিনি মত প্রকাশ করলেন, ''আট কোটি মুসলমানকে অবশিষ্ট ভারতের ইচ্ছার কাছে নত করার কোনো অহিংস পদ্ধতি আমার জানা নেই, তা সেই ইচ্ছা যত শক্তিশালী হোক না কেন। অবশিষ্ট ভারতের মতো মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। বর্তমানে আমরা যৌথ পরিবার। সেখান থেকে যে কেউ পৃথক হতেই পারে''। যদিও এর পরের অংশেই ভারতের অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন বহুদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমানরা একটি জাতি হিসাবে বসবাস করে যে ঐক্যের

বাতাবরণ গড়ে তুলেছে দেশভাগ তাকে নষ্ট করে দেবে। কিন্তু এই মত তিনি মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে চান না।

লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে সে সময়কার বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, বিশেষত গান্ধীজীর শক্ত মনোভাবের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুসলিম লিগের আগ্রাসী মনোভাবের কাছে গান্ধীজীর এই অসহায় আত্মসমর্পণ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছিল। বিশেষত, মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু ও শিখরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছিল। ফলে দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য কঠোর নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু ঐক্যের জন্য সংখ্যাগুরু হিন্দুদের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর নীতি ছিল সম্মানজনকভাবে এবং সাম্যের ভিত্তিতে সব সম্প্রদায়ের সহাবস্থান। কিন্তু হিন্দুরা যদি নিজেদের দুর্বল এবং ঐক্যহীন বলে প্রতিপন্ন করে তবে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের বীজ পুঁতে দেবে যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। সেই সময়কার ব্রিটিশ সরকারের গোপন রিপোর্টগুলোতে দেখা যায় যে মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এবং প্রতিরোধ এসেছিল হিন্দু মহাসভার কাছ থেকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার যত বেশি হচ্ছিল এবং এই সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা যত প্রবল হচ্ছিল, হিন্দু মহাসভার গণভিত্তি ততই সম্প্রসারিত হচ্ছিল। বিশেষত বঙ্গপ্রদেশে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষাপটে শ্যামাপ্রসাদের নীতি ছিল হিন্দু ঐক্যকে জোরদার করা। তিনি চাইছিলেন মুসলিম লিগের দাবিকে আর যেন গুরুত্ব না দেওয়া হয়। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলেই ভারত ঐক্যবদ্ধ থাকবে। ১৯৪০ সালের ১৪ এপ্রিল নবম বিহার প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ''স্বাধীনতা আন্দোলনে খুব বেশি মুসলমান যোগ দেননি। আমরা হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনেক ন্যায্য দাবি ছেড়ে দিয়েছি। তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে আমাদের অসহায়তা এবং দুর্বলতা বলে ভুল করা হয়েছে।'' তিনি মনে করেছিলেন যে, 'অস্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির (অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী গণ-আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) সুযোগ নিয়ে মুসলিম লিগ ভারতকে ভাগ করে মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এখন হিন্দুদের নীতি হবে আর কোনো সুবিধা না দেওয়া। আর মুসলমানদের সমর্থনের প্রত্যাশী হয়ে লাভ নেই। এবার হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের দাবির বিরোধিতা করতে হবে। কারণ মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ গঠিত হলে ভারত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু ১৯৪০-৪১ থেকেই বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। বিশেষত, নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছিল। ১৯৪১ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ হয় হিন্দুদের উপর। ১৯৪১-এর এপ্রিলে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের প্রায় ৮০টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপক লুটপাট এবং নারী নির্যাতন চলে। কয়েক হাজার হিন্দু ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে যায়। সারা বঙ্গপ্রদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বইছিল। কিন্তু হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকরী বাধা না থাকার ফলে মুসলিম লিগ তার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল ব্যাপকভিত্তিক হিন্দু ঐক্য এবং সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ। কংগ্রেস এই কাজে ব্যর্থ হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন এই সন্ধিক্ষণে।

১৯৪২ সালে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার পক্ষে একটি বড়ো আঘাত ছিল। ক্রিপসের প্রস্তাব ছিল ভারতের কোনো অঞ্চল যদি নতুন সংবিধান না মানে, কিংবা ভারতে থাকতে না চায় তবে তাকে থাকতে বাধ্য করা হবে না। ক্রিপসের প্রস্তাবে মুসলিম লিগের দাবিকেই সিলমোহর দেওয়া হয়েছিল। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে, 'ব্রিটিশ শক্তি ভারতে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে তা হলো ভারতে প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপন। কিন্তু ক্রিপস প্রস্তাবে সেই সাফল্যকেই ধ্বংস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' কিন্তু ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করে শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তি আর মুসলিম লিগের লক্ষ্যের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল গান্ধীজীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী মাদ্রাজ আইনসভায় মুসলিম লিগের পাল্টা একটি প্রস্তাব পেশ করেন সেখানে বলা হয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে, যে কমিশন উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতে মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলকে চিহ্নিত করবে এবং সেই অঞ্চলে গণভোটের মাধ্যমে ঠিক হবে তারা ভারতে থাকবে কিনা। এই প্রস্তাব মাদ্রাজ আইনসভায় পাশ হয় এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই 'রাজাজী সূত্র' গ্রহণ করে। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে, 'কোনো ভূখণ্ডের মানুষজন যদি মনে করে সে তারা ভারতীয় ইউনিয়নে থাকবে না, তাহলে সে ব্যাপারে তাদের বাধ্য করা যাবে না।'

ভারতকে অখণ্ড রাখার ভাবনার পথে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ছিল এক মারাত্মক আঘাত। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ সেখানে ভারতের পক্ষে লড়াই করেন। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের পক্ষে এবং হিন্দু মহাসভা অখণ্ড ভারতের পক্ষে লড়াই করে। এই নির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে মুসলিম লিগের ব্যাপক সাফল্য ভারতের ভবিষ্যত রাজনীতির দিনটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। এরপর শ্যামাপ্রসাদের লক্ষ্য ছিল বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা। সে কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। রক্ষা করেছিলেন এক উন্নত জনগোষ্ঠীকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে।

বাম-কংগ্রেস বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ শ্যামাপ্রসাদকে বঙ্গপ্রদেশ ভাগের জন্য দায়ী করেন। বাস্তবে শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন বঙ্গ প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে কিংবা শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের সূত্র অনুযায়ী সার্বভৌম স্বাধীন দেশ হলে ধ্বংস হয়ে যাবে হিন্দু বাঙ্গালি। স্বাধীনোত্তর যুগে পূর্বপাকিস্তান-সহ পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করে যে শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কাই ছিল সত্যি। শ্যামাপ্রসাদ তাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী রাজনীতিক। ■

দেশভাগ এবং বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রতারণা

সন্দীপ চক্রবর্তী

ইংরেজি হলোকাস্ট শব্দটির সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালি সম্যক পরিচিত। মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ যে কোনও কিশোরও বলে দেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার যে ইহুদি নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিলেন তাকে বলা হয় হলোকাস্ট। কিন্তু একটা কথা খুব কম বাঙ্গালিই জানেন, হলোকাস্টের ইতিহাস জার্মান জাতির পক্ষে যতই আত্ম-অবমাননাকর হোক, সেই ইতিহাস অস্বীকার করা বা গোপন করা আজকের জার্মানিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ কোনও জার্মান নাগরিক নাৎসি জার্মানির ইতিহাস অস্বীকার, বিকৃত বা গোপন করলে তার কাজ সে দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য।

জার্মানি এবং জার্মান জাতির প্রখর ইতিহাস চেতনার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর। কারণ, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দেশভাগের যন্ত্রণাক্লিষ্ট ইতিহাস তারা গোপন করেছেন এবং কালক্রমে বাঙ্গালিকে প্রায় ভুলিয়ে ছেড়েছেন। যার ফলে, ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালে যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন তাদের বর্তমান প্রজন্ম রাতারাতি ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারেন না। যেসব শরণার্থী এখনও জীবিত তাঁরা যখন ফেলে আসা দেশে তাদের গোলাভরা ধান, জমিজায়গা, ঘরবাড়ি এবং অত্যন্ত উন্নত এক জীবনযাপনের গল্প বলেন তখন এই ইতিহাসবোধহীন প্রজন্ম উপহাস করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নেহরুবাদী লেখক-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকরা যে বিকৃত ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন তারই সূত্র ধরে এই প্রজন্ম বিশ্বাস করে, দেশভাগ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় একটি স্বাভাবিক অঙ্গ। এর মধ্যে যেটুকু অস্বাভাবিকতা আছে তার জন্য দায়ী শুধু ব্রিটিশরা। ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠায় ইন্ধন জোগায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিহাস না থাকার ফলে এই প্রজন্ম জানেই না, ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালে (তারপর ১৯৬৪, ১৯৯২, ২০০১ এবং ২০০৫ সালে) পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল সরকারি তত্ত্বাবধানে। আয়ুব খান মন্ত্রীসভা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। নির্বিচারে বাঙ্গালি হিন্দুদের মারার জন্য কাজে লাগানো হয়েছিল পেশোয়ারের বাসিন্দা পশ্চিম পঞ্জাবের পঞ্জাবি মুসলমানদের। স্বল্প পরিসরে হিন্দুহত্যার সেই রক্তাক্ত ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। যারা জানতে চান তারা তথাগত রায়ের 'যা ছিল আমার দেশ' এবং প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর 'প্রান্তিক মানব' বইদুটি পড়ে নিতে পারেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগ এই মর্মান্তিক ইতিহাস গোপন করলেন কেন? কারণ তাঁরা জানতেন এই ইতিহাস প্রকাশিত হলে গান্ধী-নেহরু এবং কংগ্রেসের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যেত। এবং গান্ধী নেহরু দেশ স্বাধীন করেছে— এই জাতীয় মিথ ধুলোয় মিশে যেত। এই দুই নেতা অচিরেই নায়ক থেকে খলনায়কে পরিণত হতেন। ১৯৪৭-১৯৬৭, এই কুড়ি বছর একচ্ছত্র ক্ষমতাভোগী কংগ্রেসের ভিত আলগা হয়ে যেত অনেক আগেই। এই কারণেই গান্ধীবাদী এবং নেহরুবাদী ঐতিহাসিকেরা দেশভাগের ইতিহাস গোপন করেছেন। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেখকেরা এই ইতিহাসকে আরও দুর্ভেদ্য এক অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগ দেশভাগের মর্মান্তিক ইতিহাস গোপন করলেন কেন? কারণ তাঁরা জানতেন এই ইতিহাস প্রকাশিত হলে গান্ধী-নেহরু এবং কংগ্রেসের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যেত।

না, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের মধ্যে দেশভাগ নিয়ে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য— নীরদ সি চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তথাগত রায়, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লিগের শাসনকালে চাকরিক্ষেত্রে মুসলমান যুবকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। হিন্দু যুবকেরা তুলনামূলক ভাবে অধিকতর যোগ্য হয়েও চাকরি পেতেন না। আই সি এস অশোক মিত্র দেশভাগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমই। সে কখনও নিয়ম হতে পারে না। সিংহভাগ বুদ্ধিজীবীর আত্ম-প্রতারণার জন্য এ রাজ্যে দেশভাগ নিয়ে ইতিহাস রচনার আবহ তৈরি হয়নি। যা হয়েছে বাংলাদেশে। সেখানে হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ বুদ্ধিজীবী দেশভাগ নিয়ে চর্চা করেছেন। এখনও করছেন। কোনও দেশ বা জাতি তার যন্ত্রণার ইতিহাস ভোলে না। ইজরায়েল, আর্মেনিয়া, স্পেন কেউ ভোলেনি। ভুলেছে তারাই যারা বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত, পরাধীন। উদাহরণস্বরূপ, ইজিপ্ট, পারস্য মেসোপটেমিয়া এবং গ্রিসের নাম করা যেতে পারে। সুতরাং সেই সংগত প্রশ্নটির মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। আমরা বাঙ্গালিরা স্বাধীন না পরাধীন? জীবিত না মৃত? ■

‘অখণ্ড স্বাধীন বাঙ্গলা’ গড়ার নামে হিন্দুস্বার্থকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন নেতাজী-ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু

সুজিত রায়

অনেকটাই কংগ্রেসের ভুল রাজনীতি, বেশিটাই মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্রয়ে কলকাতা শহরের বুকে তখন দগদগে ঘা হয়ে রয়েছে ১৯৪৬ সালের রক্ত হিম করা দাঙ্গার বিষ। দীর্ঘদিন ধরে একই পরিবারের সহোদরের মতো বাস করছিল বাঙ্গলার মাটিতে যে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁরাই তখন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাদের উস্কানিতে পরস্পরের ওপর আঘাত হানতে উদ্যত। দেশভাগ হচ্ছেই। মাউন্টব্যাটেনের ডায়েরিতে অনুপুঙ্খভাবে লেখা দেশভাগের বর্ণপরিচয় কিংবা ধারাপাত। একদিকে জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে মহম্মদ আলি জিন্না— দুই নেতৃত্বের চরম সংঘাতে যৌথ ভারতবাসীর হেঁসেল দু’ভাগ হচ্ছেই নিশ্চিত। দড়ি টানাটানির খেলায় এপারে থাকবে কারা, কারাই বা ওপারে— এই ভাবনায় জট পাকাচ্ছে নিত্যনিয়মিত, ঠিক তখনই অখণ্ড বঙ্গভূমির প্রস্তাব নিয়ে তৎকালীন রাজনীতির জটিল রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল শরৎচন্দ্র বসুর। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বড়দা। সেটা ১৯৪৭ সালের মে মাস। বছর দুয়েক আগেই নিখোঁজ হয়েছেন ভারতের স্বপ্নের নায়ক সুভাষচন্দ্র। গোটা দেশবাসী তখন সন্দেহবাতিক হয়ে উঠছেন ক্রমশ, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চক্রান্তই কি নিখোঁজ করল সুভাষকে? শরৎচন্দ্র বসুর আবির্ভাব সেইরকম মুহূর্তেই। দোসর হুসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দি বা সুরাবর্দি। সেই সুরাবর্দি— যাঁকে স্নেহ করতেন গান্ধীজী এবং যাঁর দিকে ৪৬-এর দাঙ্গার মুখ হিসেবে আঙুল উঠেছিল হিন্দুসমাজ থেকে।

শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব ছিল— বাঙ্গলা ভাগ হবে না। বাঙ্গলা থাকবে অখণ্ড এবং স্বাধীন। আপাতত বাঙ্গলা ভারতেও যাবে না। পাকিস্তানেও যাবে না। ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে পরিস্থিতি বিচার করে স্বাধীন বাঙ্গলার প্রশাসকরা জনমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন। বাঙ্গলা ঝুঁকবে কোন দিকে। প্রস্তাবে স্পষ্টতই বলা হয়েছিল : স্বাধীন বাঙ্গলায় থাকবে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী এবং একটি জোট সরকার। সেই সরকারে সমান সংখ্যায় থাকবেন হিন্দু ও মুসলমান সদস্য। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্র বসুর লক্ষ্য ছিল— হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করুক সমাজতন্ত্র। আর বাঙ্গলা হয়ে উঠুক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক দেশ। এই সিদ্ধান্তে সায় ছিল তৎকালীন বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি, মহম্মদ আলি, ফজলুর রহমান, প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাশিম, আবদুল মালেক এবং অবিভক্ত বাঙ্গলার কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা কিরণশঙ্কর রায় ও সত্যরঞ্জন বক্সীর। সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল ২০ মে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতেই যেখানে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে সই করেছিলেন আবুল হাশিম ও শরৎচন্দ্র বসু।

ততদিনে কংগ্রেস দেশভাগের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে দিয়েছে এবং বাঙ্গলা ভাগ হবে হিন্দু এবং মুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে, সে সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও দলবিরোধী মতে সায় দিলেন যেমন কিরণশঙ্কর রায় এবং সত্যরঞ্জন বক্সী, ঠিক তেমনই মুসলিম লিগের সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করলেন স্বয়ং সুরাবর্দি এবং আবুল হাশিম। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার— যে অর্থে শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গভাগ রুখতে চেয়েছিলেন, সুরাবর্দির উদ্দেশ্য ছিল তা থেকে ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন, স্বাধীন বাঙ্গলা অখণ্ড বাঙ্গলা ছাড়াও আসামের একাংশ এবং পুর্ণিয়া জেলাকে যুক্ত করতে, যেখানে মুসলমান জনসংখ্যার প্রবল আধিক্য। সেই সঙ্গে তিনি এই প্রস্তাবও রেখেছিলেন, স্বাধীন বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন কোনো মুসলমান নেতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন কোনও হিন্দু নেতা। অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্যে চেয়েছিলেন স্বাধীন বাঙ্গলায় মুসলমান জনসংখ্যা থাকুক বহুল পরিমাণে এবং প্রশাসনের রাশও থাকুক মুসলমান নেতার হাতে। কারণ তিনি জানতেন, যদি এই প্রস্তাবকে কার্যকর করা যায়, তাহলে সবচেয়ে খুশি হবেন নতুন প্রজাতান্ত্রিক মুসলমান দেশ পাকিস্তানের জন্মদাতা জিন্নাসাহেব এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারত থেকে ছিনিয়ে বাঙ্গলাকে তুলে দেওয়া যাবে পাকিস্তানের হাতে। শরৎচন্দ্র বসুর মতো তুখোড় বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতি-পোক্ত মানুষ এটা বোঝেননি বিশ্বাস করা শক্ত এই কারণেই যে সুরাবর্দির এই প্রস্তাবে তিনি কখনও না বলেননি। তিনি এবং কিরণশঙ্কর রায় একথাও জোর করে বলার চেষ্টা করেননি যে, বাঙ্গলা স্বাধীন দেশ হলেও, সে দেশ তার সার্বভৌমত্ব এককভাবেই রক্ষা করবে। সে দেশ ভারত কিংবা পাকিস্তান কারোর তাঁবেদারিই করবে না। সুরাবর্দি এবং শরৎবাবুর এমন উদ্ভট বঙ্গপ্রীতিকে কংগ্রেস তো বটেই, মায় গান্ধীজীও প্রাথমিকভাবে বিভ্রান্তিতে ভুগলেও, পরিণতিতে সায় দেননি। কারণ তিনিও বুঝেছিলেন— এ প্রস্তাব কার্যকর হলে কলকাতা-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা পাকিস্তানের কবজায় গিয়ে পড়বে। ফুঁসে

উঠেছিল গোটা হিন্দু সমাজ। হিন্দু মহাসভার সর্বাধিনায়ক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রকাশ্যে শরৎচন্দ্র-সুরাবর্দির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, যদি প্রকৃত অর্থে দ্বিজাতি তত্ত্ব বর্জন ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা যায়, তবেই বঙ্গভঙ্গ রোধ সম্ভব। শ্রীঘোষ সরাসরি বলেন, ''কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ভারতে এক ঐক্যবদ্ধ ও বৃহদ্‌বঙ্গের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কংগ্রেস বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বঙ্গদেশ দেশ গঠন অসম্ভব মনে করে। যুক্ত বাঙ্গলা গঠনের বিরোধিতা করেন অবিভক্ত বাঙ্গলার শিল্পপতি ও বণিকসমাজও। কলকাতায় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভায় দীর্ঘ ভাষণে আর এন সরকার বলেন, ''যদি সত্যিই সুরাবর্দি এক ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গলাদেশ গঠনে আগ্রহশীল হন, তাহলে তাঁর প্রথম কাজ হবে মুসলিম লিগ থেকে পদত্যাগ করা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙ্গলাকে যুক্ত করার কথা বলা। তা না হলে সুরাবর্দির সম্পর্কে এই ধারণা হবে যে, হিন্দুপ্রধান অঞ্চল বাদ পড়লে পাকিস্তান দেশ শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভালোভাবে চলবে না— এটা তিনি উপলব্ধি করেছেন।''

কিরণশঙ্কর রায়, অখিলচন্দ্র দত্ত, নিশীথনাথ কুণ্ডু এবং আসরফউদ্দিন চৌধুরীর মতো কয়েকজন কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর সর্বশেষ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানালেও, যুক্ত বাঙ্গলা পরিকল্পনার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা ছিল বাঙ্গলার হিন্দুদের সত্যিকার সমর্থন লাভে ব্যর্থতা। প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড স্বাধীন বাঙ্গলার জন্য শরৎচন্দ্র বসু এবং সুরাবর্দির যৌথ প্রচেষ্টা এবং কিরণশঙ্কর রায় বা আবুল হাশিমের মতো কংগ্রেস ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের নেতাদের যুগলবন্দি তখন রীতিমতো হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছিল। এমন কথাও সে সময় মুখে মুখে ঘুরত— এমন আজব ভাবনা তাঁদেরই যাঁদের একজনের (সুরাবর্দির) কোনো ভূত নেই, অন্যজনের (শরৎচন্দ্র বসু) কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ফলে তাঁদের ভাবনা বাজার পায়নি।

সে সময় এমন কথাও উঠেছিল যে, দেশভাগের প্রস্তাব ঠেকাতে তফশিলি জাতির কিছু সদস্যকে অর্থের লোভ দেখানো হয়েছে। শরৎচন্দ্র নাকি সব জেনেশুনেও চুপ

শরৎ চন্দ্র বসু

করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তখন শরৎবাবুকে চিঠিতে লেখেন— জওহরলাল নেহরু এবং বল্লভভাই প্যাটেলেরও বদ্ধমূল ধারণা তাই। যদি সত্যিই এমন কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সে পথ থেকে শরৎচন্দ্রের সরে দাঁড়ানোই উচিত হবে। শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরেই তদন্ত করার দাবি তোলেন। তদন্ত হয়নি। কিন্তু বাঙ্গলা ভাগও রোখা যায়নি। কারণ, বিশাল হিন্দু সমাজের চোখে ততদিনে শরৎচন্দ্র-কিরণ শঙ্কররা 'গদ্দার'-এ পরিণত। এমনকী যখন শেষ চেষ্টায় শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীকে চিঠি লিখে বললেন, যে তিনি মনে করেন, যদি তাঁদের প্রস্তাব সম্পর্কে গণভোট নেওয়া হতো, তাহলে বাঙ্গলার অধিকাংশ হিন্দু চোখ বুজে দেশভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন, তখনও হিন্দু জনমত তাঁদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে। কারণ বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ তখন বিশ্বাস করে নিয়েছে, দেশভাগ যখন সুনিশ্চিত তখন বাঙ্গলাকে মুসলমান প্রধান দেশ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টাটা আখেরে হিন্দু বিরোধী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঙ্গলা ভাগের পক্ষেই মতামত দিয়েছিল। অমৃত বাজার পত্রিকা একটি জনমত সমীক্ষা করে। ফলাফলে দেখা যায়, পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৯৮.৩ ভাগ বাঙ্গলা বিভাগের পক্ষে রায় দিয়েছিল। তার আগে ১৯৪৭-এর ১৩ মে কলকাতা কর্পোরেশন বাঙ্গলা বিভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। বাঙ্গলা বিভাগ আন্দোলনের পক্ষে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস কমিটিগুলো হিন্দু নির্যাতনের খবর রাজ্যের নেতাদের কাছে পাঠান। সেই দরখাস্তগুলিরও বক্তব্য ছিল : বাঙ্গলা অবিভক্ত থাকলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিসেবে প্রাদেশিক সরকারের কর্ণধার হবে এবং তার ফলে হিন্দুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য খর্ব হবে। তাই ইংরেজ শাসনের আসন্ন অবসান ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গলাকে ভাগ করা হোক এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাগুলি নিয়ে আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হোক, যা স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হতে পারবে। তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার এবং হিন্দু মহসভার শীর্ষনেতা শ্যামাপ্রসদ মুখার্জির উদ্যোগেও অখণ্ড বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শ'য়ে শ'য়ে দরখাস্ত কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি '৪৬-এর দাঙ্গা এবং সুরাবর্দির ভূমিকা' প্রসঙ্গে খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন— 'পাকিস্তান হোক বা না হোক, বাঙ্গলার বর্তমান প্রাদেশিক সীমানার মধ্যেই দুটি আলদা প্রদেশ গঠনের দাবি জানাচ্ছি। বাঙ্গলা যদি পাকিস্তনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে বাঙ্গালি হিন্দু চিরতরে মুসলমান শাসনের অধীনে হয়ে যাবে... এর ফলে হিন্দু বাঙ্গালি সংস্কৃতির অবসান ঘটবে।' এর পরেও শরৎচন্দ্র বসু কীভাবে সুরাবর্দির সঙ্গে হাত মেললেন ত সত্যিই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর বলেই বোধহয় নেতাজী সুভষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরাও শরৎচন্দ্র বসুর পদক্ষেপের তীব্র সমলোচনা করে লিখিত বিবৃতি দেয় যে, 'শ্রী শরৎ বসু দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন, কেননা তিনি নিজে সুরক্ষিত এলাকায় বাস করেন... যদি তিনি নেতাজীর ভাই না হতেন, আমরা এই কাপুরুষের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতাম। আমরা চাই বঙ্গভাগ হয়ে হিন্দুপ্রধান মন্ত্রীসভা গঠিত হোক কিন্তু শরৎ বসুর মতো হিন্দু যেন সেখানে স্থান না পান। আমরা চাই শ্যামাপ্রসাদের মতো হিন্দু মন্ত্রী।'

শেষ পর্যন্ত জনসমর্থনের অভাবে যুক্তবঙ্গ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বাধীন বাঙ্গলা সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের স্বপ্নও চিরতরে ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতের রাজনীতির আকাশ থেকেও মুছে যেতে হয় একদা নক্ষত্র শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, সুরাবর্দি এবং আবুল হাসিমের মতো সুযোগসন্ধানীদের যারা দেশপ্রেমের ছলনায়, মেকি সাম্প্রদায়িকতার মুখোশে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলার হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কবরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই হয়ে গেলেন রাজনৈতিক কবরের বাসিন্দা। ■

দেশভাগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা

অভিমন্যু গুহ

ভারত ছাড়ার আগে ব্রিটিশরা এই দেশের সর্বনাশের যে পরিকল্পনা করেছিল তার মধ্যে প্রধান হলো ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে একটি অস্বাভাবিক দেশের জন্ম দিয়ে যাওয়া। যার জেরে ভারতবর্ষ আজও সন্ত্রাস কবলিত, দেশের বাইরে শত্রু, ভেতরে শত্রু নিয়ে স্বাভাবিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়ে অতীতের সম্পদশালিনী ভারতবর্ষকে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হচ্ছে; ব্রিটিশের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের মর্যাদা ভারতবর্ষের মানুষ দিতে পারেননি, দেশভাগের নির্লজ্জ বাস্তবতাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে; ব্রিটিশ উদ্ভূত এই পরিস্থিতি এতটা সহজে তৈরি হতো না, যদি না ইংরেজরা নেহরুর মতো অনুগামী আর কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার মতো পরম মিত্র লাভ করতো।

আজ কমিউনিস্টরা কথায় কথায় হিটলারের জুজু দেখায় কিন্তু একদা এই কমিউনিস্টদের গুরুঠাকুর রুশ নেতা যোসেফ স্ট্যালিনের সঙ্গে অ্যাডলফ হিটলারের দহরম মহরম ছিল। এমনকী হিটলারকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামও দিত স্ট্যালিনের রাশিয়া। হিটলার- স্ট্যালিনের এই ভাবমূর্তি ভারতের আদি কমিউনিস্টদের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে এঁরা ক্রমশ মূল স্রোতের কমিউনিস্টদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। কারণ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল যা কমিন্টার্ন নামে পরিচিত, তার ঘোষিত নীতি ছিল যে রাশিয়ার স্বার্থরক্ষাই বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্টদের একমাত্র কর্তব্য।

কারণ জারের শাসন থেকে বেরিয়ে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউনাইটেড সোভিয়েত স্টেটস অব রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাই কমিন্টার্নের যাবতীয় কর্তৃত্ব এই দেশটির হাতেই চলে যায়। আর সমাজতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার মহান উদ্যোগে কমিউনিজমের নামে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির কমিউনিস্টদের ওপর খরবদারি চালায় স্ট্যালিনের রাশিয়া। ভারতের কমিউনিস্টরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতবর্ষের আদি কমিউনিস্ট সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে কমিউনিস্টদের স্ট্যালিন আনুগত্যের কদর্যতা ধরা পড়েছিল এবং তিনি এর প্রতিবাদও করেছিলেন।

তবে হিটলার-স্ট্যালিন গোপন আঁতাত বেশিদিন গোপন থাকেনি। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট জার্মানি-রাশিয়ার মধ্যে 'নন অ্যাগ্রেশন ট্রিটি' স্বাক্ষরিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া-জার্মানি কখনোই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণে যাবে না। এই চুক্তির একটি 'সিক্রেট প্রটোকল'ও রাখা হলো, যা সেই মুহূর্তে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। যাতে করে রুশ-জার্মান সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি আরও পরিস্ফুট হয়। আন্তর্জাতিক এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের হাতের পুতুল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তিরিশের দশকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তার প্রধান কারণ যত না ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল, তার থেকেও বেশি করে ছিল রাশিয়ার স্বার্থরক্ষা। ব্রিটিশরা রুশ-জার্মান বিরোধী, এই চিন্তাই তাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে বৃহত্তর সংখ্যক কমিউনিস্টদের মহাগুরু মাও-সে-তুংও ছিল জার্মান-রুশ ঐক্যের প্রবল পন্থী।

কিন্তু পরিস্থিতির মোড় ঘুরল ১৯৪১ সালে এসে। সমস্ত চুক্তি- সন্ধি নস্যাৎ করে ২২ জুন হিটলার আক্রমণ করে বসেন রাশিয়াকে। এই পিতৃ-আক্রমণ এদেশের কমিউনিস্টদের ভীষণভাবে নাড়া দেয়। অপছন্দের হলে হিটলারের সঙ্গে তুলনায় চলে যায়। কারণটা স্পষ্ট, পিতৃ-অপমানের জ্বালা কমিউনিস্ট পার্টিকে অনবরত বইতে হচ্ছে আজও। স্রেফ রাশিয়াকে আক্রমণ, একদা হিটলার প্রেমী কমিউনিস্টদের এখন হিটলার-বিদ্বেষীতে রূপান্তরিত করেছে এবং অপছন্দের সবকিছুতে হিটলারের ছায়া দেখাতে অভ্যস্ত করে তুলেছে।

এর উপরে ১৯৪১ সালেরই ১২ জুলাই রাশিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া সংক্রান্ত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এতদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার যে রণনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে গগন বিদীর্ণ করা হচ্ছিল, এক লহমায় না হলেও আস্তে আস্তে পার্টি লাইন পাল্টে যাচ্ছিল। ১৪ ডিসেম্বর সিপিআই-এর পিসি যোশী ভারত সরকারের প্রতিনিধি রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেলবন্দি কমিউনিস্টদের মুক্তি দেওয়ার কাতর আবেদন জানালেন। সঙ্গে ব্রিটিশদের নিঃশর্ত সমর্থনের আশ্বাস। ফলে একদা যা কমিউনিস্টদের কাছে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' লড়াই ছিল, তার পন্থা বদল হলো, ব্রিটিশ সহযোগী জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হলো তা। ভারতীয় কমিউনিস্টরা রুশ সহযোগী ব্রিটিশদের মধ্যেই খুঁজে পেল তাদের নতুন প্রভুকে।

১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট গান্ধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন। শুরু হলো কমিউনিস্টদের বেনজির বিশ্বাসঘাতকতা। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনকে অবদমিত করতে সুচতুর ইংরেজ কমিউনিস্টদের ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে এও দেখা যাবে ব্রিটিশের বিশ্বস্ত অনুগত হিসেবে কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের সক্রিয় সহযোগীরূপে দেশভাগের অন্যতম কাণ্ডারি হয়ে উঠেছিল। ওই বছরে ২২ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মাধ্যমে একটি সনদ ভারতে পাঠানো হয়। সমস্ত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস, এমনকী সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ পর্যন্ত এই ক্রিপস মিশন প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু কমিউনিস্টরা। রাশিয়া সহযোগী ইংল্যান্ড তখন তাদের প্রভু। সেই প্রভুর অনুগত সেবক হিসাবে ভারতীয়দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বলিদান দেওয়া উচিত, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মুখপত্রে তা প্রচার করল, অবশ্যই 'জনযুদ্ধ' নামক নয়া তত্ত্বের মোড়কে।

শুধু তাত্ত্বিক প্রচার করেই থেমে থাকল না, নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেরিলা কায়দায় লড়াই করার জন্য 'বি-ক্যাটিগোরি' সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব পর্যন্ত নেওয়া হলো কমিউনিস্ট পার্টির তরফে। এরপর শুরু হলো ব্রিটিশ-বিরোধী যাবতীয় আন্দোলনে 'স্যাবোটেজ' করার ছক। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়্যার' সরাসরি ইংরেজদের পক্ষে তাত্ত্বিক অপযুক্তি শানাতে লাগল। তাদের মূল রাগ ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ওপর। ১৯৪৩ সালে পিপলস ওয়্যার-এর বিভিন্ন সংখ্যায় জাপানের সহযোগী হিসেবে নেতাজীকে চিহ্নিত করে নানারকম অশ্লীল ব্যঙ্গচিত্র আর কটু মন্তব্যে ভরে ওঠে কমিউনিস্ট মুখপত্রের পাতা। নেতাজীকে আখ্যা দেওয়া হয় জাপানি মার্শাল তেজোর কুকুর হিসাবেও।

নেতাজীর পাশাপাশি আরও একজন যে মানুষটি কমিউনিস্টদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন, আজ তাঁর প্রেমে এদের গদগদ দেখায়, তিনি হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরুর ঠিক আগে কমিউনিস্টদের মুখপত্রে গান্ধীজীকে কটু আক্রমণ করে দেশবাসীকে রাশিয়া ও চীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে উপদেশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ২৩ মে-১ জুন বোম্বেতে (এখন মুম্বই) কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো কমিউনিস্ট আক্রমণের হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রেহাই পেয়ে গেছেন জওহরলাল নেহরু। কারণ কমিউনিস্টরা মতাদর্শগতভাবে নেহরুকে তাদের বন্ধু মনে করত। তাছাড়া কট্টর সুভাষ-বিরোধী জওহরলালের আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরোধিতা তাকে কমিউনিস্টদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল।

স্বাধীন ভারতে ক্ষমতায় আসার পরও কমিউনিস্টদের সঙ্গে নেহরুর সখ্য বজায় থাকে। লোকদেখানি নিষিদ্ধ ঘোষণা হলেও কমিউনিস্ট নেতাদের গায়ে তার আঁচ লাগতে দেননি তাদের পরম মিত্র নেহরু। আজ যারা 'নেহরুর ভারতে'র শোকে মূহ্যমান, তাদের মতাদর্শ ঠিক কী, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদের সাংস্কৃতিক পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ বুঝতে পারা যাবে এদের দেখলে। ব্রিটিশরা যেদিন বুঝতে পারল ভারত শাসন করা আর যাবে না, সেদিন তারা জন্ম দিতে চাইল এমন এক সন্ত্রাসদীর্ণ দেশের যারা ভবিষ্যতে ভারতের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হবে। আর একাজে ইংরেজদের দিকে অকৃত্রিম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কমিউনিস্টরা।

ইতিহাসের মূল ধারা এখন কমিউনিস্টরাই কুক্ষিগত করে রেখেছে। অথচ কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহিতাকে কুনকে করে আমাদের প্রকৃত ইতিহাসের প্রকৃত পরিমাণ ঠিক করা উচিত ছিল। সেটা যে করা যায়নি তার জন্যও নেহরুর কাছে কমিউনিস্টরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক প্রবক্তা সাজ্জাদ জাহির পাকিস্তানের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ন্যায্য, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে ইতিবাচক ও গণতান্ত্রিক একটি বক্তব্য। মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্বকে কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

মুসলিম লিগকে দিয়ে ইংরেজরা ভারতকে দুর্বল করতে দেশ-বিভাজনের যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তাতে কিছু পক্ষের প্রত্যক্ষ মদতের প্রয়োজন ছিল। একদিকে কমিউনিস্টদের পাশে পেয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশরা, অন্যদিকে লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রতি আসক্ত নেহরুকেও প্রধানমন্ত্রিত্বের টোপে বন্দি করে ফেলেছিল ইংরেজরা। পাকিস্তানের দাবির পক্ষে কমিউনিস্ট মুখপত্র স্রেফ তাদের সমর্থনই জানায়নি পূর্ব পাকিস্তানের নকশা তৈরি করা থেকে শুরু করে বাঁটোয়ারাও করে দিয়েছিল, যার পেছনে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদত অবশ্যসম্ভাবীই ছিল।

পরিশেষে বলা চলে ইংরেজদের উদ্দেশ্য একপ্রকার সফলই হয়েছে। কাশ্মীর সমস্যা থেকে শ্যামাপ্রসাদ হত্যা, ভারতকে দুর্বল করতে নেহরুর অসামান্য সব কুকীর্তি, আর স্বাধীন ভারতকে চীনের তাঁবেদারিতে এখন পাকিস্তানের হয়ে ওকালতিতে কমিউনিস্টদের অক্লান্ত প্রয়াস ভারতবাসী মাত্রেরই ভোলা অসম্ভব। আরও দুর্ভাগ্যের, ইতিহাসের মূল ধারা এখন কমিউনিস্টরাই কুক্ষিগত করে রেখেছে। অথচ কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহিতাকে কুনকে করে আমাদের প্রকৃত ইতিহাসের প্রকৃত পরিমাণ ঠিক করা উচিত ছিল। সেটা যে করা যায়নি তার জন্যও নেহরুর কাছে কমিউনিস্টরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তাই এই দেশদ্রোহী মতাদর্শের লোকেরা আজও নেহরুপন্থী ভারতের শোকে মূহ্যমান থাকে, আর দেশের খেয়ে-পরে দেশবাসীরই দাড়ি ওপড়ায়। মোদীর 'শক্ত সমর্থ ভারত' দেখলে আর্তনাদ তো এদের ক্রোমোজমিয় বৈশিষ্ট, জিনে লেখা।

তথ্য ঋণ :

(১) কমিউনিস্ট পার্টি : মুখ ও মুখোশ—জাবালি। (২) ওরা শুধু ভুল করে যায়—শান্তনু সিংহ।

দেশভাগ এবং একটি দুরপনেয় কলঙ্ক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তুলে ভারতকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং তার মুসলিম লিগ। একথা কেউ স্বীকার করুন বা না করুন, মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসাবে যেদিন পাকিস্তান আদায় করে নিয়ে গিয়েছিলেন জিন্নাহ, কার্যত সেদিনই স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল হিন্দুদের আবাসভূমি এই ভারতবর্ষই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা যখন মুসলিম লিগের ভয়াবহ অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে ভারতে আশ্রয়ের খোঁজ করছিলেন, তখন কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল অতীব নিন্দনীয়। অসহায় সেই মানুষগুলির আর্তিতে সাড়া তো দেয়ইনি কংগ্রেস, বরং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আচরণই বলে দেবে তাদের নির্লিপ্ততা এবং ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হওয়া পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের জন্য কী বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং নোয়াখালিতে গণহত্যায় মুসলিম লিগের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই বুঝে গিয়েছিলেন দেশভাগটা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। জিন্নাহর দাবি অনুযায়ী পাকিস্তান না দিলে ভারতকে আরও রক্তক্ষয়ী গণহ্যাতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনকী তৎকালীন বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত গান্ধীকে বলেছিলেন—'১৬ আগস্ট (১৯৪৬) মহড়া হিসাবে জিন্নাহ কলকাতায় ৫ হাজার লোককে হত্যা করেছে। কাজেই জিন্নাহকে এখন থামাতে না পারলে ভারতে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।' [Mountbatten and the Partition of India Vol. 1–Collins & Lapiere] অবস্থাটি যখন এই, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতো কেউ কেউ বুঝেছিলেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যদি অনিবার্যই হয়, তাহলে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জন বিনিময় জরুরি। তা না করে যদি দেশভাগ করা হয়, তাহলে পাকিস্তানে হিন্দুরা বিপন্ন হয়ে পড়বে। এবং আরও একবার রক্তক্ষয়ী গণহত্যার সাক্ষী হয়ে থাকবে এই উপমহাদেশ। ১৯৪৬-এর আগস্টে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং ওই বছরেরই অক্টোবরে নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন আম্বেদকর এবং শ্যামাপ্রসাদদের সংখ্যালঘু বিনিময়ের কথাটি ভাবতে শিখিয়েছিল। আম্বেদকর এবং শ্যামাপ্রসাদ জন বিনিময়ের কথা বলার আগেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়ে জিন্নাহ বলেছিলেন— 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন আমি নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি না... আমার হাতে একটি রিভলবার আছে আমি জানি সেটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে।' জিন্নাহর অনুগামী মুসলিম লিগ নেতা লিয়াকত আলি খান বলেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে বোঝায় আইন ভেঙে যে কোনো রকম কাজ করা।' আর মুসলিম লিগ জিন্নাহর ছবি দেওয়া একটি প্রচার পত্রে লিখল--- 'আমরা মুসলমানরা রাজমুকুট পরে দেশ শাসন করেছি। উৎসাহ হারিও না। প্রস্তুত হও এবং হাতে অস্ত্র তুলে নাও। হে মুসলমানগণ একবার ভেবে দেখ আজ আমরা কাফেরদের অধীন। কাফেরদের ভালোবাসার পরিণাম ভালো নয়। হে কাফেরগণ, সুখ বা গর্ব অনুভব কোরো না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা বিজয়ীর বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।' এর পরের ঘটনা ইতিহাস। জিন্নাহর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলশ্রুতি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং নোয়াখালির হিন্দু নিধনের বর্বরতা সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল। এই দুটি ঘটনার ভিতরই অশনি সংকেত খুঁজে পেয়েছিলেন আম্বেদকর এবং শ্যামাপ্রসাদরা। আম্বেদকর বলেছিলেন, 'একথা সন্দেহাতীত যে, সংখ্যালঘু বিনিময়ই হচ্ছে শান্তি স্থাপনের স্থায়ী প্রতিকার।' সেই সঙ্গে আম্বেদকরের এই দাবিও ছিল পঞ্জাব এবং

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, ১৯৪৬।

বাঙ্গলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (দ্রষ্টব্য : পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক— অমলেন্দু দে)।

আম্বেদকর মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমানের একটি জাতি হিসেবে বেড়ে ওঠার আশা দুরাশা মাত্র। আম্বেদকরের মতে, বিগত কয়েকশো বছরেও ভারতবাসী একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে— সে আশা করা বৃথা (দ্রষ্টব্য : পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক— অমলেন্দু দে)। 'পাকিস্তান অর দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আম্বেদকর মুসলমান ধর্মীয় বিধান এবং অনুশাসন, ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীদের নৃশংস অত্যাচার এবং মুসলিম লিগের জন্ম থেকে শুরু করে চল্লিশের দশক পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছিলেন, কেন মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চান না।

গান্ধী, নেহরু এবং কংগ্রেসের অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতিটি বিচার করে দেখার কোনো সদিচ্ছাই ছিল না। খিলাফত আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে তুলে ধরে গান্ধী অবশ্য এর অনেক আগেই একটি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলেন। মুসলমান মন জয় করতে গিয়ে কার্যত মুসলমান মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে বসেছিলেন গান্ধী। গান্ধীর সেই সময়ের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ। বলতে গেলে এই খিলাফত আন্দোলনই কিন্তু মুসলিম লিগের স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল। গান্ধী এবং কংগ্রেস তাদের এই অত্যধিক তোষণ নীতির কারণেও স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে সংখ্যালঘু বিনিময়ের আবশ্যিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বা বলা ভালো বুঝতে চাননি। আম্বেদকর এবং শ্যামাপ্রসাদরা যখন সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব দিলেন, তখন গান্ধী বলেছিলেন, 'লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারছি না। আমি মনে করি ওটা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব।' জওহরলাল নেহরুও আম্বেদকরের এই প্রস্তাবকে বিরক্তিভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকী বাস্তব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে গিয়ে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের পর গান্ধী বলেছিলেন— 'এখন আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।... আমরা ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যাই। এটা উচিত নয়। যারা পালিয়ে যায় ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর যখন অন্তরে আছেন, তখন পালিয়ে যাবার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ যখন মারা যায়, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এটা ঘটে। আমাদের যদি কেউ পেটায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরই এটা ঘটান' (দ্রষ্টব্য : মহাত্মা গান্ধী নির্বাচিত রচনা)। নোয়াখালির গণহত্যার পরও নোয়াখালি পরিদর্শনে গিয়ে গান্ধী বললেন— 'পাকিস্তান হওয়া না হওয়া নিয়ে ঝগড়া করতে আমি এখানে আসিনি। জনগণ চাইলে পাকিস্তান হবে, না হলে হবে না।' ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানতে পারা যায়, নোয়াখালিতে মুসলমানরা গান্ধীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ওই একরোখা মনোভাব দেখেও গান্ধী বুঝতে চেষ্টা করেননি হিন্দুদের কপালে কী দুর্দশা লেখা আছে। বরং কিছু আজগুবি কথা তিনি বললেন— পূর্ববঙ্গে বসবাসরত হিন্দুদের উদ্দেশে। গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব নির্মল কুমার বসুর বক্তব্য থেকে জানা যায়, গান্ধী পূর্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছিলেন, '...অহিংস ধর্ম অনুসারে তারা আক্রান্ত হয়েও আক্রমণকারীকে আঘাত করবে না' (দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশের ইতিহাস— রমেশচন্দ্র মজুমদার)। আসলে গান্ধীর ধারণা ছিল তিনি একাই ভারত ভাগ আটকে দিতে পারবেন। তাই বলেছিলেন— 'আমি যতদিন বেঁচে আছি ভারতভাগে সম্মতি দেব না।' কিন্তু নেহরু-আজাদ-প্যাটেলদের চাপে ভারত ভাগ যখন আটকাতে পারলেন না, তখনও গান্ধী একবারও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবলেন না— পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের কী অবস্থা হবে। বরং, স্বাধীনতার পর পাকিস্তানকে ৫০ কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য অনশনে বসার মনস্থ করলেন।

কংগ্রেসের এই নীতিটিকেই আম্বেদকরের মনে হয়েছিল মুসলমান তোষণ। আম্বেদকর লিখেছিলেন— 'কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের নীতি হলো সহনশীলতা এবং রাজনৈতিক ও অন্য সুবিধাদান দ্বারা মুসলমান তোষণ। ...আমার মনে হয় কংগ্রেস দুটো জিনিস বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, তোষণ

নোয়াখালির মুসলমান দাঙ্গাবাজরা।

ও নিষ্পত্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যর্থতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোষণের অর্থ হলো, যেসব আক্রমণকারী নির্দোষ ও নিরীহ মানুষের উপর খুন, ধর্ষণ, লুঠ এবং অগ্নিসংযোগের মতো কার্যকলাপে অভ্যস্ত তাদের দোষ উপেক্ষা করে তাদের উৎকোচ দিয়ে বশে রাখা। অপর পক্ষে নিষ্পত্তির অর্থ হলো একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া যা কোনো পক্ষই অতিক্রম করতে পারবে না। তোষণ আক্রমণকারীর দাবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো সীমারেখা স্থাপন করে না। নিষ্পত্তি তা করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এই কথাটি বুঝতে ব্যর্থ যে, সুবিধাদানের নীতি মুসলমানদের আক্রমণাত্মক মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যা সবচেয়ে খারাপ তা হলো মুসলমানরা এই সব সুবিধাদানকে হিন্দুদের পরাজয় বরণের মানসিকতা এবং বাধা দেওয়ার শক্তির অভাব বলে বর্ণনা করে। এই তোষণ নীতি হিন্দুদের একই ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে যা হিটলারের প্রতি তোষণের নীতির পরিমাণ হিসাবে মিত্রশক্তিকে ভোগ করতে হয়েছিল' (দ্রষ্টব্য : Dr. Babasaheb Ambedkar Writing & Speeches, Vol. 1)।

কংগ্রেসের এই আচরণকে নিন্দা করেছেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও। তিনি লিখছেন, 'যখন স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তখন পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, যত সংখ্যক হিন্দু বিতাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত নবাগত হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে, ইহা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাজ্যে অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লওয়া বন্ধ করিতে হইবে। যে দুখানি চিঠিতে নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরকাল মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের দুরপনেয় কলঙ্ক ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে' (দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশের ইতিহাস— রমেশচন্দ্র মজুমদার)।

১৯৪৭-এ দেশভাগের ভিতর দিয়েই পাকিস্তানে হিন্দু নিধন শেষ হয়ে যায়নি। দেশভাগের অব্যবহতি পরেই ১৯৪৯ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫০ সালের মার্চ অবধি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থী এসে আশ্রয় নিলেন পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টি যখন ব্যাপক আকার নিল তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে দিল্লিতে আহ্বান জানালেন। লিয়াকত দিল্লিতে এলেন এবং সাতদিন দিল্লিতে অবস্থান করলেন। অবশেষে কার্যত নেহরুকে বোকা বানিয়েই একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশে ফিরে গেলেন। এই চুক্তিটিই হলো ঐতিহাসিক নেহরু-লিয়াকত চুক্তি। এই চুক্তিতে বলা হলো— (১) উভয় সরকার নিজ নিজ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যাবতীয় নিরাপত্তার বিধান করবে। যাতে উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য না হন।

(২) ইতিমধ্যে যারা দেশত্যাগ করেছেন তারা নিজ নিজ দেশে যাতে ফিরে যান তার জন্য তাদের বোঝাতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। নেহরু সানন্দে এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বসলেন কিন্তু বুঝলেন না, অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসে আশ্রয় নেওয়া হিন্দুরা ফের পাকিস্তানে ফিরে গেলে আবার একইরকম অত্যাচারের সম্মুখীন হবেন। নেহরু এও বুঝলেন না, লিয়াকত তাঁকে দিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানের কুকীর্তি ঢাকা দিতে চাইছেন। তবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বি আর আম্বেদকর, শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। চুক্তির বিরোধিতা করে শ্যামাপ্রসাদ এবং ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগও করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ অভিযোগ করেছিলেন, নেহরু পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙ্গালি শরণার্থীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। সংসদে শ্যামাপ্রসাদ এও বলেছিলেন, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হবে সংখ্যালঘু বিনিময়ে এবং ভারত-পাকিস্তানের সীমানা পুনঃর্নির্ধারণ। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের এই প্রস্তাব মানেননি নেহরু। নেহরু বলেছিলেন— সংখ্যালঘু বিনিময় সম্ভব নয়। আর সীমানা পুনর্নির্ধারণের অর্থ যুদ্ধ করা।

শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না— তা প্রমাণ হয় কয়েকবছরের ভিতরই। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন। তার আগেই পূর্বপাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গিয়ে ভয় দেখাতে থাকে সেনাবাহিনী। হিন্দুদের ওপর নতুন করে শুরু হয় অত্যাচার। নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে পাকিস্তান কার্যত নিক্ষেপ করে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। পূর্ব পাকিস্তানে আইন পরিষদের সভায় এর প্রতিবাদ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সুতার। কিন্তু তাঁকে কট্টর ইসলামপন্থীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। প্রমাণ হয়ে যায়, নেহরু পাক নেতাদের চিনতেই পারেননি।

গঙ্গা দিয়ে জল অনেক গড়িয়েছে। ১৯৬৪, ১৯৭০, ১৯৯২ অনেকবারই অত্যাচারিত হিন্দুরা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে বারেবারেই প্রাণ হাতে করে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে যে বিশ্বাসঘাতকতা তাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই ক্ষত সহ্য করেই বারে বারে তারা সীমানা পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতের রাজপথে। অতীতের সেই দুরপনেয় কলঙ্ক মোছাবার একটি সুযোগ বোধহয় এসেছে আবার ভারতের সামনে। সুযোগ এসেছে এই হতভাগ্য হিন্দু শরণার্থীদের বুকে টেনে নেবার, তাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেবার, মর্যাদা দেবার। ■

রক্ষাবন্ধন : ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকউৎসব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নেহাতই সমাপতন। শ্রাবণী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা যা হিন্দোলের সমাপ্তি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এটি কৃষ্ণভজনার এক মহাপুণ্যদিন। পূজা-আরতি, ভোগ নিবেদন, কীর্তন ও ভজন গানের মধ্য দিয়ে পালন করেন তাঁরা দিনটি। বঙ্গদেশে অবশ্য ঝুলনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সাতটি দিন বিশেষ করে ছেলে-মেয়েরা নানারকম পুতুল দিয়ে, পাহাড় বানিয়ে তা নানা ভাবে সাজিয়ে নিজেদের সৃজনকর্মের পরিচয় দেয়। বাচ্চাদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন বড়োরাও। ঝুলনের শেষ বা পূর্ণিমায় পুরোহিত ছাড়া নিজেরাই লুচি পায়েস ইত্যাদি রাধা-কৃষ্ণের প্রতি নিবেদন করে বাচ্চাদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেন। এই ভাবে সকলকে খাইয়ে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি পান সকলে। এখন অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় ছোটোরা নয়, পেশাদার শিল্পীদের দিয়েই ঝুলন সাজানো বা মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই শ্রাবণী বা ঝুলন পূর্ণিমারই একটি অনুষ্ঠান রাখি বা রক্ষাবন্ধন। কেউ কেউ এই কারণে দিনটিকে রাখি পূর্ণিমা হিসেবেও অভিহিত করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, রাখি বা রক্ষাবন্ধনের সঙ্গে ঝুলনযাত্রার কোনো সম্পর্কই নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা, রাখি বা রক্ষাবন্ধন সম্পূর্ণ ভাবেই একটি লৌকিক উৎসব। এরসঙ্গে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানই যুক্ত নয়। অবশ্য পশ্চিম বা উত্তর ভারতে অনেকে এই দিনে পিতৃপুরুষকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষ তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করেন। সেক্ষেত্রে পুরোহিতের প্রয়োজন হলেও অনুষ্ঠান হিসেবে রক্ষাবন্ধনের সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কোনো যোগই নেই। এই উৎসবের উৎস জনজীবন। সেখান থেকেই স্বতোৎসারিত এই রাখি বা রক্ষাবন্ধন উৎসব।

রক্ষাবন্ধনের মূল আয়োজক মহিলারা। ভাই, স্বামী বা অন্য পরিজনদের সুরক্ষা, তাদের মঙ্গলকামনায় নারী এদিন হাতে বেঁধে দেন মঙ্গলসূত্র। সেই সুতোর সঙ্গে থাকে অন্তরের যোগ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে এই উৎসব বহুকাল ধরেই একটা বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে। নারী তার স্নেহ ভালোবাসা, অন্তরের সবটুকু সদিচ্ছা দিয়ে শুভকামনা জানায় ভাই, স্বামী বা অন্যান্যদের। বাঙ্গালির ভাইফোঁটার মতোই রক্ষাবন্ধনও সামাজিক সম্প্রীতি, পারিবারিক অন্তর বন্ধনের এক অপূর্ব প্রীতিময় অনুষ্ঠান। একদিক থেকে এটি এক অনন্য অনুষ্ঠান। পৃথিবীর আর কোথাও এমন কোনো একটি অনুষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যাবে না।

মেয়েরা ভাই-স্বামী বা অন্যান্যদের আরতি করে হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয়। প্রতিদানে ছেলেরা তুলে নেয় নিজেদের সাধ্যমতো বিভিন্ন উপহার।

দেশ বিদেশের নৃ-বিজ্ঞানীরা ভারতের রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠানের নানা দিক পর্যালোচনা করে মনে করেন, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি লৌকিক উৎসব।

লৌকিক উৎসব হলেও, কোনো কোনো পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে এই উৎসবের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন একটি পৌরাণিক কাহিনিতে আছে, একবার দেবাসুরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। টানা বারো বছর ধরে চলে সে যুদ্ধ। শেষপর্যন্ত কিন্তু সে যুদ্ধে জয়ী হয় অসুররাই। দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবতারা সে যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবেই পর্যুদস্ত হয়।

পরাজিত দেবতারা যান তাঁদের গুরু বৃহস্পতির কাছে। জানতে চান, কেন এমন হলো? কেন তাঁরা আজ পরাজিত? স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের কি আর কোনো পথই নেই।

সব শুনে বৃহস্পতি বলেন, দেবরাজ ইন্দ্র হীনবল হয়ে পড়ার কারণেই এই পরাজয়।

তাহলে উপায়?

আকুল কণ্ঠেই জানতে চান দেবরাজ। তাহলে এমন করেই পরাজিতের জীবনযাপন করতে হবে।

বৃহস্পতি বলেন, উপায় একটা আছে।

কী? কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যাবে এঅবস্থা থেকে?

বৃহস্পতি

'যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্র মহাবলঃ।

তেন ত্বাং অনুবদ্ধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।।'

এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বলেন, এই মন্ত্রে সঞ্জীবিত করতে হবে একটি মঙ্গলসূত্রকে। তারপর সেটি ইন্দ্রের ডান হাতে বেঁধে দেবেন ইন্দ্রাণী। তাহলেই বল ফিরে পাবেন ইন্দ্র। পরাজিত হবে অসুররাও।

দেবগুরু বৃহস্পতির নির্দেশ মতো একটি মন্ত্রে সঞ্জীবিত মঙ্গলসূত্রটি ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দেন তাঁর স্ত্রী শচী। সেই মঙ্গলসূত্রের গুণেই ইন্দ্র ফিরে পেলেন তাঁর শৌর্য-বীর্য। প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করে উদ্ধার করেন তিনি অমরাবতী।

দেবগুরু বৃহস্পতির এই মন্ত্র উচ্চারণের দিনটি ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। তারপর থেকেই দিনটি হয়ে ওঠে এমন তাৎপর্যপূর্ণ। রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হয় তারপর থেকে— এই শ্রাবণী পূর্ণিমায়, এমনই বিশ্বাস একদল পণ্ডিতের।

ভাইফোঁটার মতোই রক্ষাবন্ধন সম্পর্কিত এক পৌরাণিক কাহিনিতে রয়েছে যম ও যমুনার কথা। বলা হয়েছে, প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় যমুনা ভাই যমকে রাখি পরান তাঁর দীর্ঘ, সুস্থ ও নিরাপদ জীবন কামনা করে। আর এ থেকেই নাকি শ্রাবণী পূর্ণিমায় ভাইদের মঙ্গল কামনায় রাখি পরানোর রীতির সূত্রপাত।

ভবিষ্য পুরাণের উত্তরপর্বে আছে, একবার জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে ডেকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শ্রাবণী পূর্ণিমায় রাজপুরোহিতকে দিয়ে মন্ত্রপুত রক্ষাবন্ধনী অবশ্যই বাঁধবে। এতে তোমরা নিরাপদ থাকবে। রক্ষাবন্ধনীর এই মহিমার কারণেই নারীরা অন্যদের রাখি পরিয়ে থাকেন। প্রাথমিক পর্বে যা ছিল শুধুই মাত্র শোধিত সূত্র, কালক্রমে তা পরিণত হয়েছে প্রায় অলংকারে।

মহাভারতের একটি কাহিনিতে বলা হয়েছে, একবার শিশুপালের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের আঙুল বিক্ষত হয়। রক্ত ঝরতে থাকে ক্রমাগত। তা দেখে অস্থির দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি পরনের শাড়ি ছিঁড়ে সেই টুকরো দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দেন। আর তাতেই বন্ধ হয় রক্ত পড়া। সে দিনটাও নাকি ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা।

তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এখন থেকে এই দিনে কারো হাতে সুতো বেঁধে দিলে তার জীবন থাকবে সুরক্ষিত। আর এরই সূত্র ধরে নাকি প্রবর্তন রক্ষাবন্ধন উৎসবের।

রাখি শুধু ভাই, স্বামী বা অন্যান্য পরিজন বা বন্ধুবান্ধবদের পরানো হয় না, পরানো হয় যে কোনো মানুষকে। সেখানে বর্ণ, শ্রেণী বা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। এমনকী মুসলমান ভাইকে রাখি পরাচ্ছে হিন্দু বোন, এমন ঘটনার বহু ঐতিহাসিক নজিরও রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বলতে হয় চিতোরের রানি কর্ণাবতী এবং মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনের কথা। চিতোরের বিধবা রানি কর্ণাবতী হুমায়ুনকে রাখি পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে 'রাখি-ভাই' সম্পর্ক গড়েন। বোনের মর্যাদা রাখতে বাদশাহ হুমায়ুন পরবর্তীকালে তাঁর পাশে থেকেছেন বলেই ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন।

মুঘল বা তার পরবর্তীকালেও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পরস্পরকে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির এক অপরূপ নিদর্শন রাখতেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত কবি নজির আকবরবাদী (১৭৩৫-১৮৩০) রাখি নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। তার শেষ স্তবকে তিনি লিখেছেন, 'আমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মতোই ধুতি-চাদর পরে কপালে তিলক কাটতে চাই। তাহলে আমার চারপাশের ভালো মানুষগুলিকে আমি রাখি পরাবার সুযোগ পাব।'

রাখি বা রক্ষাবন্ধনের এমন অসম্প্রদায়িক অথচ সর্বজন কল্যাণ কামী রূপ দেখেই এক বিশিষ্ট বিদেশি নৃ-বিজ্ঞানী বলেছেন, রাখি বা রক্ষাবন্ধন হলো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক উৎসব।

(শ্রাবণী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে যে, লেখাপড়া করিবার জন্য কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি ট্রাস্টের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইবে। উপযুক্ত প্রমাণপত্র ও সুপারিশ সহ আবেদন গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। :—

নবম এবং দশম শ্রেণী বার্ষিক	১০০০ টাকা
একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী বার্ষিক	১৫০০ টাকা
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক	২০০০ টাকা

আবেদনপত্র সম্পাদক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট-কে করিতে হইবে।

৫.৮.২০১৯

সম্পাদক

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

বৌবাজার ঠাকুরবাড়ির ঝুলনযাত্রা

সপ্তর্ষি ঘোষ

মধ্য কলকাতার বৌবাজার এলাকায় বাবুরাম শীল লেনে রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ির ঝুলন কলকাতার একটি অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝুলনযাত্রা। রামকানাই

অধিকারীর প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন অধিকারী আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে বৌবাজারে ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঝুলনযাত্রার সূত্রপাত করেন, অবিচ্ছিন্নভাবে যা আজও অব্যাহত। কষ্টিপাথরে নির্মিত কৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা মূর্তি কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অত্যন্ত নয়নাভিরাম এই যুগল মূর্তি।

কৃষ্ণমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁর প্রপৌত্র রামকানাই অধিকারী ঠাকুরবাড়ির উন্নতিসাধন করেন এবং তাঁর সময় থেকেই ঝুলনে জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। রামকানাই নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করেন এবং ঝুলন উৎসবের জন্য একটি রূপো ও সোনার সিংহাসন নির্মাণ করেন। ঠাকুরবাড়ির নিত্যসেবা এবং অন্যান্য উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য রামকানাই একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯২৫ সালে) ৭২ বছর বয়সে রামকানাই অধিকারীর জীবনাবসান হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র ধর্মদাস অধিকারী ঠাকুরবাড়ির সেবায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে তিনি প্রয়াত হন। পরবর্তীকালে ধর্মদাস অধিকারীর দুই পুত্র শিবদাস ও দেবদাস অধিকারীর উপর সেবায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমৃত্যু তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মও পূর্বসুরির ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছেন।

ঝুলনের পাঁচ দিন রাধাকৃষ্ণকে যথাক্রমে রাখাল, যোগী, সুবল, কোটাল এবং রাজবেশ— পাঁচরকম বেশে সাজানো হয়। একদা প্রয়াত শিবদাস অধিকারী মহাশয় নিজে রাধাকৃষ্ণকে সাজাতেন। বর্তমানে তাঁর পুত্র শুভাশিস এই দায়িত্ব পালন করেন। ঝুলনের শেষ দিনে রাধাকৃষ্ণকে সোনার সিংহাসনে বসানো হয়। ঐতিহ্যপূর্ণ ঝুলনযাত্রা দেখতে পাঁচ দিন বহু দর্শকের সমাগম হয়। প্রতিদিনই অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

ঝুলনের পাঁচ দিন সন্ধ্যারতির পর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের আসর বসে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে। অতীতে যদু ভট্ট, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, গিরিশ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। সেই ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের সুরের মূর্ছনায় ঝুলনের পাঁচ দিন রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে একটা সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়, যা সঙ্গীত রসিক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে।

পাঁচদিন ব্যাপী ঝুলনযাত্রা শুরু হবে ১১ আগস্ট, যার পরিসমাপ্তি হবে ১৫ আগস্ট। এবারও যথারীতি মজলিশ বসবে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে।

(শ্রাবণী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

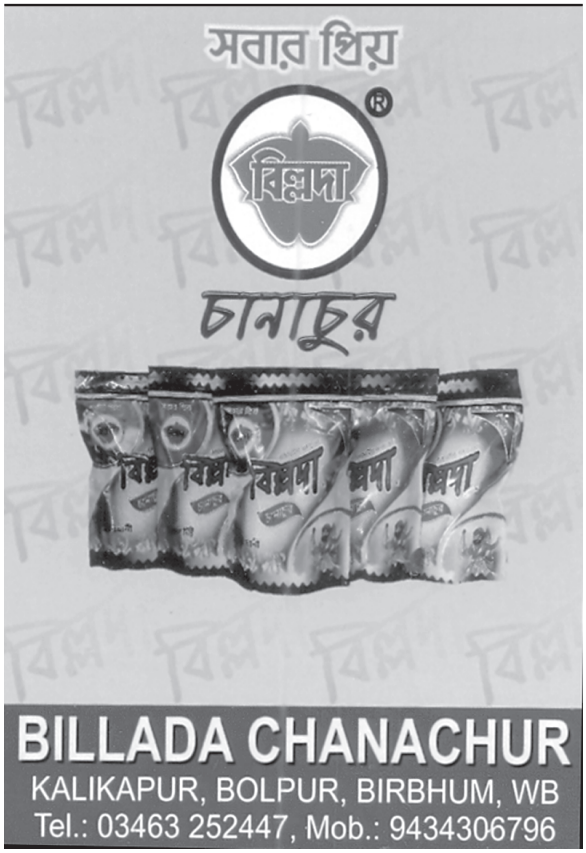

শ্রীঅরবিন্দের ভারতবর্ষ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ফুটলো অরবিন্দ

১৮৭৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শে বিপিনচন্দ্র পাল (৭ নভেম্বর, ১৮৫৮ — ২০ মে, ১৯৩২) হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে হলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে তিনি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড গেলেন (১৮৮৯)। বাগ্মিতার জন্যই সেখান থেকে অন্য একটি বৃত্তি নিয়ে গেলেন আমেরিকা। দুর্দান্ত সেই বক্তৃতা, শুনে মোহিত হয়ে যেতেন মানুষ; তখনও স্বামীজী আমেরিকায় পৌঁছাননি। কিন্তু প্রবল ধাক্কা খেলেন আমেরিকার এক শ্রোতার কাছ থেকে। তিনি এক অতি সত্য অথচ তেতো কথা শোনালেন বিপিনকে, বললেন একজন পরাধীন দেশের মানুষের কাছ থেকে কোনো কথাই তারা শুনবেন না, শুনলেও তা গ্রহণ করবেন না। কথাটি দারুণ বাজলো বিপিনের। শপথ নিলেন দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতেই হবে, তারজন্য অগ্রণী ভূমিকা নেবেনই তিনি। ফিরলেন দেশে, সুযোগ পেলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ন্যাশানাল লাইব্রেরি) গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করার, পড়লেন অসংখ্য বই। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের দীক্ষায় দেশের সনাতনী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহ বাড়লো। সেইসময় দেশপ্রেম আর হিন্দুত্বের প্রতি আগ্রহ সমার্থক বলে বিবেচিত হত। ১৮৯২ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে নিলেন বৈষ্ণব মতে দীক্ষা। এরপরই শুরু হল রাজনৈতিক সক্রিয়তা—অনলবর্ষী বক্তৃতা আর সেই সঙ্গে চললো নির্ভীক কলম। ১৯০১ সালে সম্পাদনা করলেন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউইন্ডিয়া'। তাতে চললো রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার। বুঝলেন দেশের কাজের জন্য বলিষ্ঠ মানুষ চাই। যোগ্য মানুষ তৈরির জন্য তাই দেশবাসীকে বারেবারে উদ্বুদ্ধ করলেন। সেইসময় বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে শেষ করে দেবার জন্য বাঙ্গলাকে ভাগ করলো ইংরেজ। ১৯০৫-এ শুরু হলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, তার রাশ নিজের হাতে নিলেন বিপিনচন্দ্র। ১৯০৬-এর আগস্টে প্রকাশ করলেন ইংরেজি দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' তাতে শামিল করলেন অরবিন্দ ঘোষকে। ব্যাস, আগুনে রাঙা হল বাঙ্গলার বিপ্লববাদের দাবানল।

> "প্রত্যেক ভারতবাসী তার পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের কাজ করবেন। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে একটি জোর-ঝটকা, সময়ে সময়ে অধিক প্রাসঙ্গিক, কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি নড়বড়ে হলে চলে না।"

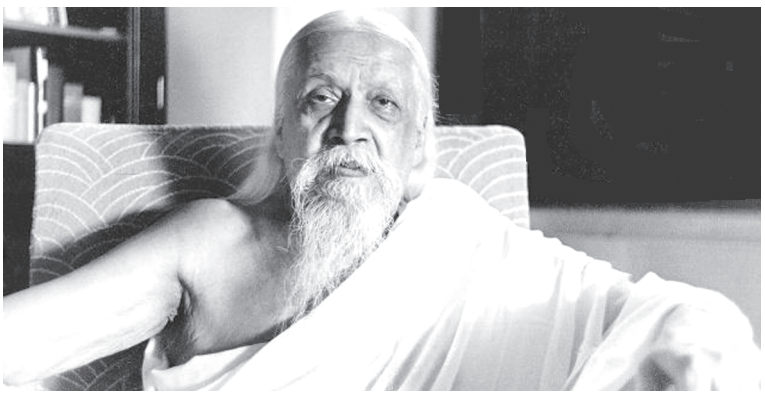

অর্থাৎ অখণ্ডতার সাধনা দিয়েই অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ শুরু হলো। অখণ্ড বাঙ্গলার জন্য আন্দোলন। বঙ্গজননী আর ভারতমাতা অরবিন্দের কাছে অভিন্ন। বাঙ্গলাকে ভাগ করতে দেওয়া যায় না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়ে দেশমাতৃকার ঋণ শোধ করতে উদ্যত হলেন অরবিন্দ।

অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনা

ভারতমাতা হলেন অখণ্ড ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মাতৃকা সাধনার এক সনাতনী ভৌমরূপ। ভারতবর্ষ নামক এক অতুল্য দেশকে জননী জ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তির নামই ভারতমাতাপূজা। যে দেশে আমার জন্ম, যে দেশের সম্পদ গ্রহণ করে আমার এই শরীর, যে দেশের গৌরবে আমার অন্তঃকরণ আনন্দ লাভ করে, যে দেশ আমাকে অন্তরাত্মার সন্ধান দিয়েছে—তারই মাতৃরূপা ভারতমাতা। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় 'আর্যবীণা' পর্যায়ে 'ভারতমাতা' নামে দুটি কবিতা রচনা করে (৯ এবং ২৩ সংখ্যক)। 'আর্যবীণা' কাব্য-পর্যায়ে ছাড়াও 'বিষণ্ণাভারতী', 'আয় ভারতসন্তান' প্রভৃতি কবিতায় ভারতমাতার আভাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকের (১৯০৫) চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে দেখা যায় পৃথ্বীরাজ গাইছেন যুদ্ধে আহ্বানের গান; যেন ভারতমাতা ডাক দিয়েছেন—মোগলদের বিপ্রতীপে দেশের পীড়িত ধর্মকে রক্ষা করতে হবে, হিন্দুস্থানের বিপন্না জননী-জায়াকে রক্ষা করতে হবে, রক্ষা করতে হবে নিলাঞ্ছিত ভারত নারীকে। আর সেজন্যই রণসাজে যেতে হবে সমরে।

''ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা!

রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ওই ডাকে 'ভারতমাতা'।

কে বল করিবে প্রাণের মায়া, যখন বিপন্না জননী–জায়া?

সাজ সাজ সকলে রণসাজে শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!

চল সমরে দিব জীবন ঢালি জয় মা ভারত, জয় মা কালী!''

এখানে ভারতমাতার স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। আর ভারতমাতার সন্তানেরা কোষনিবদ্ধ তরবারি নিয়ে লড়াই করবেন। আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮১) উপন্যাসে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারার উদ্ভব হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে সেই ক্ষীর প্রবাহিত হয়ে পরিপুষ্ট লাভ করল। স্বামীজী বলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। ভগিনী নিবেদিতার 'Kali the Mother' কবিতার আদর্শে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনায় ব্রতী হলেন অরবিন্দ।

ভারতমাতার সামনে সঙ্কল্প মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশমাতাকে রক্ষা করার পুণ্য শপথ নিই আমরা। দেবীকে অর্ঘ্য সমর্পণ করে ধ্যান করা হয় অখণ্ড ভারতবর্ষের, স্মরণ করা হয় তাঁর চিন্ময়ী রূপ, সে আরাধ্য মূর্তি যেন দশভুজা দেবী দুর্গা। ভারতমাতার পুজো মানে রাষ্ট্রীয় বেড়া বাধার ব্রত, দেশকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলার ব্যায়াম, ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী গড়ে তোলার রাখিবন্ধন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ গ্রহণ। যে মাটি আমাদের খাদ্যের ভাণ্ডার, যে মাটিতে আমাদের পদচারণা, যে মাটির বুকে আমাদের বসতি, তাকে ধন্যবাদ দেবার চিরন্তন-চিন্তনই যেন ভারতমাতার পুজো। মাটি-ই মা, মাতৃকা আরাধনার চরম দার্শনিকতা হলো ভারতমাতার পুজো। ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি; এই দেশ কেবল আমাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানই দেয়নি, দিয়েছে এক অচিন্ত্য বিস্ময়—''Each soul is potentially divine.'' ভারতবাসী অমৃতের সন্তান, পুণ্য-পবিত্র।

শ্রীঅরবিন্দের দেশমাতা

৩০ শে আগস্ট, ১৯০৫-এ অরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে (২৪শে আগস্টে লেখা পত্রের উত্তরে) একটি পত্রে লিখছেন, ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়েছেন সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল তাহা ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মতো ছাড়িয়া দিলাম। .....আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদেরও হিত করিতে হয়। ....অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ....কার্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।...''

শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। দেশমাতাকে দেবী দুর্গাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন বঙ্কিম। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে যে দেশমাতা, তিনি যেন দেবী দুর্গারই অন্যতম রূপ। ''বাহুতে তুমি মা শক্তি / হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি / তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। / ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী / কমলা কমল দল-বিহারিণী''। শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্রেও দেখতে পাই ভারতবর্ষ নামক দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তিনি দেবীকে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রকট হতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। ''Mother Durga! Rider on the lion, giver of all strength, Mother, beloved of Siva! We, born from thy parts of Power, we the youth of India, are seated here in thy temple. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India.''

ভারতকে কেন বড়ো হতে হবে?

শ্রীঅরবিন্দের Inclusive Hinduism and Social Inclusion সম্পর্কে পরিপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে। তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় 'ধর্ম-রক্ষিণী সভা'-য় এলেন ভাষণ দিতে ১৯০৯ সালের ৬ ই মে। এটি 'Uttarpara Speech' নামে বিখ্যাত। বললেন, ''অন্যান্য ধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও ও মতবাদ, কিন্তু সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিস যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্যে এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। এই ধর্ম দেবার জন্যেই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্বলকে পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকিরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড় হতে হবে তাও তার নিজের জন্যে নয়, মানবজাতির জন্যে।' (বাংলা অনুবাদ ঃ অনিলবরণ রায়) (''Other religions are preponderatingly religious of faith and profession, but the Sanatan Dharma is life itself; it is a thing that has not so much to be believed as lived. This is the Dharma that for the Salvation of humanity was cherished in the seclusion of this peninsula from of old. It is to give this religion that India is rising. She does not rise as other countries do, for self or when she is strong, to trample on the weak. She is rising to shed the eternal light entrusted to her over the world. India has always existed for humanity and not for herself and it is for humanity and not for herself

that she must be great.'')

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ এবং সনাতনধর্ম এক এবং অভিন্ন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তাঁর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেয়েছি এবং সে বক্তব্য আদতে ভগবান কৃষ্ণের বলে তিনি অভিহিত করেছেন। ''When.... it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatan Dharma that India exists. To magnify the religion means to magnify the country.'' (যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকেই বড়ো করে তোলা।''

তখনও তিনি তথাকথিত ঋষি হয়ে ওঠেননি। মানিকতলা বোমার মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তার আগে এক বছর কারাগারের নির্জন বাসে কাটিয়ে কারা-জাতক বাসুদেবের দর্শন পেয়েছেন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে যা বলবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তা বলা হল না, বরং যে কথা তিনি বললেন, তা কারা-দেবতা বাসুদেবেরই কথা যাঁর দিব্য দর্শন পেয়েছিলেন আলিপুর জেলের কুঠুরিতে বসে। অরবিন্দ বলছেন—''I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatan Dharma, with it moves and with it it grows. When the Sanatan Dharma declines, then the nation declines, and if the Sanatan Dharma were capable of perishing, with the Sanatan Dharma it would perish.'' ''আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতনধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশলাভ করে; যখন সনাতনধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতনধর্মের ধ্বংস হওয়ার সম্ভব হতো তাহলে সনাতনধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হতো।''

কারাগারে যোগাভ্যাস

শ্রীঅরবিন্দ 'কারাকাহিনি' গ্রন্থে লিখলেন, ''কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত।... এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। ....জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিষ্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। ...কাল যেন তাহার (বিদ্রোহী মন) উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তিরহিত। তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরূপ মনের গতিতে নির্জন কারাবাসের কয়েদি উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে য়ুরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন।

ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধহয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না।... তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্যে লাগান আমার ভোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা-সকল নিরীক্ষণ করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।'' ক্রমে যোগাভ্যাস করে শ্রীঅরবিন্দ কারাজীবনে পেলেন এক পরমানন্দের সন্ধান। তখন আর মনে হত না, কারার উচ্চ দেওয়ালে তিনি বন্দি। সর্বত্রই দেখতেন বাসুদেবের দিব্য উপস্থিতি। কয়েদিদের দেহের মধ্যে যেন পরিলক্ষিত হচ্ছিল ভগবান নারায়ণ। সাধুপুরুষ আর ছোটোলোকের মধ্যে ভেদ খুঁজে পেলেন না। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি বলছেন, ''যে জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দি নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপরে শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম

ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম—চোর, খুনি, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম।.... ভগবান আমাকে বললেন, দেখ, কী সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।

শ্রী অরবিন্দকে নিয়ে রবীন্দ্র

শান্তিনিকেতনে বসে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'নমস্কার' কবিতাখানি; যার শুরুতেই চমক, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' পাণ্ডুলিপির পাতার উপরে 'ওঁ' লিখে শুরু করছেন কবিতা। পরের দুই পংক্তিতে রয়েছে, অরবিন্দকে কবির সম্বোধন— ''তোমা লাগি নহে মান / নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান / চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি / বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি!" অরবিন্দের সঙ্কট যাত্রাপথে 'আরাম' যেন লজ্জিত শিরে নত হয়; 'মৃত্যু' ভুলে যায় ভয়। তিনি বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান; কারণ তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে দেশের হয়ে চাইছেন 'পূর্ণ অধিকার', সত্যের গৌরব। আর বিধাতাও যেন প্রার্থনা শুনেছেন, তাই বেজে উঠেছে জয়শঙ্খ।

অরবিন্দ কারাবরণ করেছেন (১৯০৮ সালের ২রা মে বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার এবং ৫ই মে থেকে আলিপুর জেলে বন্দি), তাই তাঁর ডান হাতে আজ 'কঠোর আদর'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, এই কারা বেদনা থেকেই দেশের মানুষ বল পাবেন। অরবিন্দ 'রুদ্রদূত', দেবতার প্রদীপ হাতে করেই তাঁর আবির্ভাব। তাই কেউই তাঁকে শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন না। এমনকী তাঁর বন্ধন-শৃঙ্খল তারই চরণ বন্দনা করছে, কারাগার জানাচ্ছে অভ্যর্থনা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, মিথ্যাবাদী রাজা তার রাজদণ্ড প্রয়োগ করেছেন এমনই এক ব্যক্তিত্বকে যিনি সৃষ্ট হয়েছেন প্রলয়-অনলে; যিনি পেয়েছেন শত্রুদের মাঝে রাতের অন্ধকারে। এ কেমন খেলা! তবে কিছুই কি নেই দুঃখ, ক্ষত, ক্ষতি, সর্বভয়? তবে কিছুই কী নেই রাজা, রজদণ্ড, মৃত্যু, অত্যাচার? যদি তা নাই থাকে, যদি বিধাতা পুরুষ নিজের সৃষ্টিকে ভয়ের পরিমণ্ডলে পাঠাতে পারেন অনায়াসে, তবে কেন আমরা ভীরু, মূঢ় হয়ে মাথা নামিয়েছি নীচে? কেন বলতে পারছি না, তোমার চির-সত্তা স্থির শাশ্বত সত্য বলেই আমাদের মাথা উঁচু করে তুলতে হবে।

গীতার ভূমিকা এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন

শ্রীঅরবিন্দ 'গীতার ভূমিকা' গ্রন্থে লিখছেন, ''...একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন।... রাজা ধর্মরক্ষা করিবেন, প্রজারঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতা ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন।... শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন।.... শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি যুগের প্রধান বিপ্লবকারী।... সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধের ঈশ্বরনির্দিষ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহারথী অর্জুন।" শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে মনে হয় ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে এমন ব্যক্তির চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যার মধ্যে যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের সমবেত ঐশ্বর্য রয়েছে। ভাগবত শক্তির মোহন চূড়া নরশ্রেষ্ঠের কপালে জয়টীকা পরিয়ে দেবে এবং সমগ্র বিশ্ব সাক্ষী থাকবে সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের।

রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ ছাড়া কি আর কিছু পন্থা আছে?

একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের রাজনৈতিক আঙ্গিক ব্যতিরেকেও অনান্য পন্থা রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

১। 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত করা যায়। আজকের দিনে বিক্রি হয়ে যাওয়া সাংবাদিক, সম্পাদক ও অপরাপর সংবাদমাধ্যমগুলি দেখিয়ে দেয়, দেশবিরোধিতার কৌশল শিক্ষিত সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং অজান্তেই তারা প্রতিবেশী দেশের প্যাসিভ সাপোর্টার হয়ে যান। কাজেই সুস্থ সাংবাদিকতাও একটি দেশপ্রেম।

২। দেশপ্রেম জাগ্রত হয় দেশের মাঙ্গলিক ও শুভঙ্করী ঐতিহ্যের সঙ্গে মানসিক নৈকট্যে। অরবিন্দের অগুনতি লেখা সেই ভারতবোধ সঞ্জাত।

৩। রাষ্ট্রবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ্য সঙ্গত দেশপ্রেম। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে সে পথ দেখিয়েছেন।

৪। ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির অনুসরণ মানেই জাতীয়তাবাদ, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, অন্যত্রও তার প্রকাশ আমরা বারে বারে দেখেছি।

৫। সামাজিক মেলবন্ধন ও মিলনমন্দির ভাবনা এক অনবদ্য জাতীয়তাবোধের প্রকাশভূমি। শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দির, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'শাখা', শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার কেন্দ্র প্রভৃতিকে এককথায় সামাজিক জাতীয়তাবাদের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস বলা যায়। কাজেই প্রত্যেক ভারতবাসী তার পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের কাজ করবেন। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে একটি জোর-ঝটকা, সময়ে সময়ে অধিক প্রাসঙ্গিক, কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি নড়বড়ে হলে চলে না। অন্য নানা পথে সমন্বিতভাবে এগোতে হবে, তবেই গৈরিক জাতীয়তাবাদ ভারতরাষ্ট্রে চিরায়ত (sustainable) সংস্কৃতির অঙ্গ হবে। নইলে 'বানের জল' এসে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদকে 'ঘোলা' করে দেবেই, সুতরাং সাবধান থাকতেই হবে।

(শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

‘খেলো ইন্ডিয়াই’ পতাকা তুলে ধরবে : মনমিৎ সিংহ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পর ৭২ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দেশের সার্বিক ক্রীড়াসংস্কৃতির তেমন উচ্চকোটি সোপান তৈরি হয়নি, যার ওপর দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সাকার রূপ দিতে পেরেছে। এবার বোধহয় অবস্থার পরিবর্তন হতে চলেছে ‘খেলো ইন্ডিয়া’ রূপায়ণের মাধ্যমে। কলকাতা সাই কেন্দ্রের কর্তা মনমিৎ সিংহ গোয়েন্ডি এব্যাপারে যুক্তিনিষ্ঠ আলোকপাত করলেন :

□ খেলো ইন্ডিয়া কি ভারতকে পথ দেখাবে ভবিষ্যতে?

মনমিৎ সিংহ : ইতিমধ্যেই পথ তৈরি করে ফেলেছে খেলো ইন্ডিয়া। মাত্র দুবছরেই সুফল ফলতে শুরু করেছে। গত বছর এশিয়ান গেমসে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স করেছে ভারতীয়রা। দেশের প্রতিটি স্কুল ও ক্লাবকে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে শামিল করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে যদি নানা ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করে, তার থেকে কয়েক হাজার প্রতিভা বেছে নেওয়া সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সাই যেমন এতবছর ধরে দেশের প্রতিভা অন্বেষণ ও কোচ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি এই নতুন সরকারি প্রকল্প এবার দেশকে বিশ্বের ক্রীড়াসংস্কৃতির ম্যাপে আলোকবর্তিকার অংশরূপে তুলে ধরবে।

□ বিগত ৭২ বছরে কী প্রত্যাশিত ফল দেখা গেছে খেলার মাঠে?

মনমিৎ সিংহ : হয়তো অন্যান্য দেশ যত দ্রুত উন্নতি করেছে সেই ভাবে ভারত এগিয়ে যেতে পারেনি। স্বাধীনতার পর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় খেলা ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করা হয়নি অনেক বছর। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সে তুলনায় বাজেট খানিকটা বাড়িয়েছে। খেলো ইন্ডিয়ার মতো কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভারত যে হকিতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আধিপত্য করেছে তার পিছনে কেন্দ্রের সরকারের কোনো অবদান নেই। ভারতীয় হকি সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিই এই সাফল্য ও গৌরবের সিংহভাগ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। তারপর থেকে হকি সংস্থায় দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ব্যাপার চলে এল আর ভারতও বিশ্ব হকির এলিট ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেল। এখন আবার নরেন্দ্র বাত্রার নেতৃত্বে বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে হকি ইন্ডিয়া। তাই আবার ভারতীয় হকি বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমান তালে লড়াই করছে। একই কথা প্রযোজ্য ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, টেনিস, কুস্তি, বক্সিং ও শ্যুটিং এইসব খেলার ক্ষেত্রে। এই খেলাগুলি ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক সম্মান ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। সবকিছুর পিছনে রয়েছে সেই সব খেলার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক দক্ষতাও। সাংগঠনিক তৎপরতাই চালিকাশক্তি।

□ তাহলে সাইয়ের ভূমিকাটি ঠিক কী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে?

মনমিৎ সিংহ : সাই তৈরি হবার পর স্পেশাল এরিয়া গেমস, সেন্টার অব এক্সেলেন্স, স্পোর্টস অ্যান্ড গেম ট্রেনিং সেন্টার প্রকল্পের মাধ্যমে দূর প্রত্যন্ত, প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ এমনকী বিশাল সংখ্যক জনজাতি সমাজের কাছে খেলার প্রতি আগ্রহ নির্মাণ করা গেছে। এইসব অঞ্চল থেকে অসংখ্য শিশু-কিশোর প্রতিভা উঠে এসেছে যারা উপরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় থাকার

সুযোগ পেয়ে নিজেদের আরও পরিশীলিত করে তুলতে পেরেছে। এইসব ছেলে-মেয়েরা পরবর্তীকালে উন্নত ট্রেনিং ও খাবার-দাবার পাওয়ার সুবাদে বড়ো অ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদে পরিণত হয়েছে। অনেকে দেশের জন্য অনেক পদক জিতে নিয়ে এসেছে এশিয় ও বিশ্ব মিট থেকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কথা। যারা সাইয়ের সমান্তরাল ভূমিকা পালন করে চলেছে। কল্যাণ আশ্রমও জনজাতি সমাজের মূল স্রোতে ঢুকে তাদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলা ও তাদের জাতীয় জীবনে অঙ্গীভূত করার জন্য খেলা ও ব্যায়াম, যোগাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে প্রাত্যহিক জীবনে।

□ এশিয় থেকে বিশ্বপর্যায়ে কবে উন্নীত হবে ভারত?

মনমিৎ সিংহ : সময় এসে গেছে। পথও তৈরি হয়ে গেছে। আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছে, ভারতকে আর খেলায় পিছিয়ে পড়া দেশ বলা যাবে না। ব্যাডমিন্টন, তিরন্দাজি শ্যুটিং, বক্সিং, কুস্তির মতো বিশ্বজনীন খেলার বড়ো বড়ো ইভেন্টে ভারতীয়রা পদক জিতছে। প্রথম দশের মধ্যে অবস্থান করছে কেউ কেউ। বজরং পুনিয়া, মেরি কম, মীরাবাই চানু বর্তমানে তিনটি পৃথক ইভেন্টে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তিরন্দাজিতেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হেভিওয়েট দেশ ভারত। এখন ভালো পরিকাঠামো, ভালো স্পনসর, ভালো কোচিং সব পাওয়া যাচ্ছে। এই তিনটি বিষয় যদি ঠিকমতো ব্যবস্থা করা যায় তবে উন্নতি সময়ের অপেক্ষা। এত বছর এই তিনটি স্তরকে ঠিকমতো কাজে লাগানো যায়নি। ■

পিঁপড়ে

পিঁপড়েরা পৃথিবীতে এসেছে আটকোটি বছর আগে। জগৎ জুড়ে আজ প্রায় আট হাজার আটশো প্রজাতির পিঁপড়ে পরিবেশের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়ে বসবাস করছে। মানুষের মতো পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের মতো পিঁপড়েরাও কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে ঘুরছে কিংবা কোথা থেকে আসছে সবকিছু মনে রাখতে পারে। বিশাল বিশাল দলে পিঁপড়ের পদযাত্রা দেখে বিস্মিত হতে হয়। কী অসম্ভব প্রাণশক্তি। বিশ্রাম যেন ওদের অভিধানে নেই। খাবার কোথায় আছে, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা, হাজারো বিপত্তি কাটিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো, আবার খাদ্য সংগ্রহ করে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে নিজেদের ঘরে ফিরে আসা। জীবজগতে এদের মতো পরিশ্রমী আর কে আছে জানি না। এরা অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। একা কোনো খাবার খায় না। আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গে আমরা চার রকমের পিঁপড়ে দেখতে পাই। কালো সড়সড়ে, কেউ বলেন **সুড়সুড়ি পিঁপড়ে**, আকারে ছোট্ট। গায়ে উঠলে সুড়সুড়ি লাগে। এরা কামড়ায় না। **লাল পিঁপড়ে**। একই আকারের। গায়ের রঙ লাল। কামড়ায়। **কাঠ পিঁপড়েরা** মূলত গাছের ডালে থাকে। কামড়ায়। আকারে বড়ো। আকারে দশ মিলিমিটার **ডেয়োপিঁপড়ে**। কামড়ায়। জ্বালা করে।

পিঁপড়েরা সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণী। পাঁচিলের ফাঁকফোঁকরে, গাছের ডালে, মাটিতে গর্ত করে এরা বাস করে। পুরুষ, রানি ও শ্রমিক আছে। শ্রমিকরা খাবার জোগাড় করে ও কলোনি পাহারা দেয়। নিজেদের মধ্যে এরা ঝগড়া করে না। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, নিজেদের জীবন ধারণের জন্য এরা ছশো রকম জীবকে পালন করে। এদের দেহ থেকে এরা সুস্বাদু রস পান করে। পিঁপড়েদের এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে। প্রকৃতিক দুর্যোগ, তা সে ঝড়বৃষ্টি যাই হোক না কেন আগে থেকে টের পেয়ে যায়। দুর্যোগ অসার আগেই এরা ডিম ও অন্যান্য জিনিস নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলে। অপরিসীম ক্ষমতা এদের। নিজেদের ওজনের কুড়িগুণ ওজন এরা বইতে পারে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চোখ এরা খুলে দিতে পারে। পরিবেশকে ধ্বংস না করে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা, নিজেদের মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের বাতাবরণ, নিজেদের মধ্যে কোনোরকম হিংসা নেই, সবাই সবার পরিপূরক, নতুন প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি নানা গুণ আমরা পিঁপড়ের থেকে শিখতে পারি।

বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে এদের নানা প্রজাতি। **মিট ইটিং অ্যান্ট**। এরা অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। পোশাকি নাম গ্রাভেল অ্যান্ট। **আগুন পিঁপড়ে**। বিশ্বের সবচেয়ে ছোটো পিঁপড়ে এরা। এদের বহু নাম। ফায়ার অ্যান্ট নামেই বেশি পরিচিত। এদের এক কামড়েই ধরাশায়ী হতে পারে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এদের দেখা যায়। **সিমাই পিঁপড়ে (টোমক্যাট)**। এরা মারাত্মক বিষাক্ত। মাত্র এক সেন্টিমিটার দেহে কেউটের চেয়ে বারো গুণ বিষ নিয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। এদের ৪৬ হাজার উপপ্রজাতি আছে। পৃথিবীর সব দেশেই এদের বসবাস। তবে ইন্দোনেশিয়ায় এদের বেশি দেখা যায়। **তাঁতিপিঁপড়ে বা তন্তুবায় পিপীলিকা (ওয়েভারঅ্যান্ট, গ্রিন অ্যান্ট)**। এদের বসবাস আফ্রিকা ও ভারত। ঘন জঙ্গলের মধ্যে এরা থাকে। **মধু পিঁপড়ে বা হানি অ্যান্ট**। এদের বসবাস মেক্সিকো অঞ্চলে। এক প্রকার পতঙ্গের শরীর থেকে রস পান করে। **সংগ্রামী পিঁপড়ে**। পেরু থেকে মেক্সিকোর জঙ্গলে থাকে। **প্যারাসোল অ্যান্ট**। গাছের পাতা দিয়ে এরা বাসা বানায়। সব দেশেই থাকে। **যাযাবর ও ছুতোর পিঁপড়ে**। এরা গরম দেশের প্রাণী। খুবই হিংস্র। **চাষি পিঁপড়ে**। এরা পাতা জমা করে রাখে। পচে গিয়ে ছত্রাক হলে সেটা খেয়েই বেঁচে থাকে। **গ্রাসকাটার পিঁপড়ে**। পৃথিবীর সব দেশেই এদের দেখা যায়।

এক গবেষণায় জানা যাচ্ছে, পিঁপড়ে খুবই উপকারী প্রাণী। বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে এদের জুড়ি মেলা ভার। এরা বাতাস থেকে ক্ষতিকারক কার্বনডাই অক্সাইড শুষে নেয়। বিজ্ঞানীরা একমত যে, পৃথিবীর স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্রের সফল ও সুসংহত জীব হলো পিঁপড়ে। এদের ফেরোমোন নিঃসরণ এবং ব্যবহার কৌশল সত্যিই চমৎকার। পরস্পরের শরীরে এরা রক্ত পাঠাতে পারে। শিশুপিঁপড়েরা এর ফলে বেঁচে থাকে। এরা প্রকৃতির বিন্দুমাত্র সম্পদের অপচয় করে না।

তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

রণথম্বোর

রণ আর থম্বোর পাশাপাশি দুই পাহাড় জুড়ে রণথম্বোর। হিংস্র জন্তুজনোয়ারে পরিপূর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মাঝে সাত কিলেমিটার ব্যাপী প্রাচীরে ঘেরা সুরক্ষিত দুর্গ রণথম্বোর। আকার ও আয়তনে চিতোরের পরেই এর স্থান। চারটি তোরণ পেরিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে হয়। মূল তেরণটির নাম বড়া দরওয়াজা। এব বুরুজ ও গম্বুজগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এখন এখানে গড়ে উঠেছে রণথম্বোর জাতীয় উদ্যান-- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র। দেখা যাবে বাঘ, প্যান্থার, নীলগাই, চিঙ্কারা, শম্বর, বন্য শুয়ের, হায়না, লেপার্ড, শিয়াল, বনবিড়াল যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের ঢালে রয়েছে পদম, রাজবাগ ও মিলাক— ৩ টি লেক। পদম লেকটি পদ্মে ভরা থাকে। শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখিতে তিনটি লেকই ভরে যায়। লেকের জলে কুমির আছে। এখানে আছে রাজা হামিরের রাজপ্রাসাদ, দুলহা মহল, রানি তালাও, রঘুনাথজী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, দিগম্বর জৈন মন্দির, কালী মন্দির, মহাবীরজী জৈন তীর্থ ইত্যাদি।

জানো কি?

- পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৮৭৫২ বর্গ কিলোমিটার।
- জনসংখ্যা ৯১৩৪৭৭৩৬।
- ভারতের জনসংখ্যার হারে ৭.৫৫ শতাংশ।
- পুরুষ ৪৬৯২৭৩৮৯ জন।
- মহিলা ৪৪৪২০৩৪৭ জন।
- প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস ১০২৯ জন।
- প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী ৯৪৭ জন।
- সাক্ষরের হার ৭৭.০৮ শতাংশ।
- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫ সেমি।

ভালো কথা

টাইমকল পাহারা

আমাদের শহরে এমনিতেই জলের খুব অভাব। বিশেষ করে পানীয় জলের। বেশ কয়েকটা কুয়ো আছে, তবে খুবই নীচে জল। ভোর থেকেই সবাই দড়ি-বালতি নিয়ে জল তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়িতে মেপে জল ব্যবহার করতে হয়। এত কষ্ট তবু রাস্তার টাইমকলের মুখ খোলা । যখন জল আসে তখন প্রচুর জল নষ্ট হয়। সেদিন পাড়ার দাদারা সব কলে মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। সবাইকে বলে দিয়েছে মুখ যেন খোলা না থাকে। পাড়ার ছোটোদের দায়িত্ব দিয়েছে কল পাহারা দিতে। আমরা দায়িত্ব পেয়ে খুব খুশি। স্কুলে যেতে আসতে নজর রাখি। রবিবারেও তিনবার করে পাড়া ঘুরে দেখে আসি। ঠাকুমা বলল এটা অনেক আগেই করার দরকার ছিল।

শ্যামলী সেন, নবম শ্রেণী নামোপাড়া ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ময়না পাখি

সমন্বিতা সাহা, চতুর্থশ্রেণী, মঙ্গলবাড়ি, মালদা।

ময়না পাখি ডাকাডাকি
কর কেন গাছে?
বেড়াল ছানা ধরবে তোমায়
ভয় পেওনা পাছে।

ভালুক ভায়া লম্ফ দিয়ে
ধরবে তোমার ঠ্যাং
থপ্ থপ্ থপ্ হেঁটে বেড়ায়
ছোট্টো একটি ব্যাং।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২।।

সে সময় ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব চলছে। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের ৬০ বছর পূর্ণ হলো। ইংরেজরা সে জন্য সারা দেশে উৎসব পালন করল, ছাত্রছাত্রীদের মিষ্টি খাওয়ানো হলো।

কেশব নিজের মিষ্টি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এর কিছু দিন বাদে নাগপুরের বুকের উপর সীতাবর্তী কেল্লায় ইংরেজদের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে দেখে মনে বড় দুঃখ পেল কেশব।

মোদী সরকারের উদ্যোগে এক মধ্যযুগীয় প্রথার অবসান

ধর্মানন্দ দেব

মুসলমান মহিলাদের অধিকারকে বিধিবদ্ধ আইনে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। শরিয়ত আইনের তকমা দিয়ে তিন তালাক প্রথা (তালাক-ই-বিদ্দাত), নিকা হালালা এবং বহু বিবাহ প্রথাকে অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং চরম লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বলে অবিলম্বে এই আইন রদ করার জন্য ভারতীয় মুসলমান নারী সমাজ এবং মুসলমান সংগঠনগুলি সুপ্রিমকোর্টে আর্জি রেখেছিল। বহুদিনের অপেক্ষারত মুসলমান নারীদের এই অধিকার রক্ষার দাবিটি উত্থাপিত হয়েছিল মুসলমান নারীসমাজ থেকেই। 'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন' মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষাকে বিধিবদ্ধ করার দাবি করেছিল। ২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর এই সংগঠনের সংগঠক নুরজাহান সোফিয়া নিয়াজ এবং জাকিয়া সোমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে মহিলাদের অধিকার রক্ষাকে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দানের দাবি করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর হাতে ওইদিন তুলে দেওয়া পত্রে তাঁরা বলেছিলেন—"কিছু গোঁড়া পিতৃতান্ত্রিক প্রভুত্ববাদী পুরুষ মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার বিতর্কে প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে। এর ফলে মুসলমান মহিলারা কোরানে স্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানে নারী ও পুরুষকে যে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।" তাঁরা ওদের দাবির প্রশ্নে সারা দেশের মুসলমান মহিলাদের ওপর যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা চালিয়েছে তারও ফলাফল তুলে ধরে বলা হয়েছিল, ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৩৭ সালের শরিয়ত আইন এবং মুসলমান বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯-কে হয় সংশোধন করতে হবে নতুবা নতুন করে মুসলিম পার্সোনাল ল' চালু করতে হবে।

অন্যদিকে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি. এস ঠাকুরের নেতৃত্বে এক ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত সবগুলো জনস্বার্থ মামলা একসঙ্গে যুক্ত করে শুনানি শুরু করেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে তাদের আর্জি ছিল, মুসলমান বিবাহ, তালাক, বহুবিবাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমন একটা আইন প্রণয়ন করা হোক, যেখানে একতরফা তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করার মতো বিষয়গুলো অপরাধ বলে গণ্য হবে। এখন মুসলমান পুরুষ ইচ্ছামতো তিনবার 'তালাক' বলে ডিভোর্স দেয়। এমনকী ইদানীং টেলিফোন, টেক্সট ম্যাসেজিং, ফেসবুক, ওয়াটসঅ্যাপ বা স্কাইপের মাধ্যমেও ডিভোর্স দেওয়া শুরু হয়েছে। কেউ কেউ তো পোস্টকার্ড লিখে তালাক দিচ্ছেন। কোরানে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিন তালাক হচ্ছে কেন? এই অন্যায় অবিচারের অবসান চায় মুসলমান নারীরা। নারীবাদী মুসলমান মহিলাদের আইনজীবী শীর্ষ আদালতে বলেন—'মুসলিম পার্সোনেল ল' ভারতীয় আইন ব্যবস্থা বা বিচার ব্যবস্থার বাইরে হতে পারে না।'

মুসলমান মহিলাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী ন্যায় পাইয়ে দেওয়া সরকারের যেমন কর্তব্য, তেমনি দেশের জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যও তালাকপ্রথা বন্ধ হওয়া জরুরি। রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হওয়ার পর দেশের আইনমন্ত্রী বলেছেন, "আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। মুসলমান মহিলাদের ন্যায় পাইয়ে দিতে সক্ষম দুই কক্ষ। এটা ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়ার সূচনা।"

ওই মোকদ্দমায় ভারতের মুসলিম পার্সোনেল ল' বোর্ডের পক্ষ থেকে এক হলফনামা দিয়ে বলা হয়, তিন তালাক, বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি পবিত্র কোরানের অনুশাসন বিধি অনুসারে পালিত হয়। এতে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এটা নাকি আদালতের এক্তিয়ারের বাহিরে। এইসব বিধি রদ করার সঙ্গে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন জড়িত। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত। সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগকেও ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। ভারতে যে-কোনো ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের ধর্মীয় প্রথা পালন করার অধিকার দিতে হবে। মুসলিম পার্সোনেল ল' বোর্ডের মতে, সমাজ সংস্কারের নামে মুসলমানদের ব্যক্তিগত নিয়মবিধি পুনর্লিখিত হতে পারে না। তাই কোনো মুসলমান পুরুষ মৌখিকভাবে তিনবার তালাক উচ্চারণ করে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারে। এটা মুসলমান আইনে বৈধ।

অন্যদিকে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে কেন্দ্রের মোদী সরকার জানিয়েছে তিন তালাক প্রথা অন্যায় ও অসাংবিধানিক। এই প্রথা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এটা মুসলমান

ফঃ ৬

নারীদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন, এটা ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টির প্রশ্ন নয়। এটা ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নও নয়। সৌদি আরবের মতো দেশে মুসলমান বিবাহ এবং ডিভোর্সের জন্য আলাদা বিধি আছে। পরে সুপ্রিম কোর্টের ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে তিন তালাক অসাংবিধানিক বলে রায় প্রদান করে। ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট তারিখে সুপ্রিমকোর্ট রায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে আইন তৈরির অনুরোধ জানায়।

কিন্তু তিন তালাক অবৈধ বলে দেশের সুপ্রিমকোর্টের ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের নির্দেশের পরেও কিন্তু তাৎক্ষণিক তালাক প্রথা জারি ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশে। যেমন ভোজপুরী অভিনেত্রীর ঘটনা। ওই অভিনেত্রীর মতে তাঁর স্বামী নাকি তাঁকে স্ট্যাম্প পেপারে তালাকনামা পাঠিয়েছেন। তাই ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে মোদী সরকার তিন তালাক বিল লোকসভায় পেশ করে এবং ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়। কিন্তু সেইসময় রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সমর্থন আদায় করতে পারেনি মোদী সরকার। বিলটি সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানান বিরোধী সাংসদরা। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্যই কংগ্রেস এই বিলকে সমর্থন করেনি রাজ্যসভায়। তারপর বাধ্য হয়ে ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ তিন তালাক নিয়ে অর্ডিনেন্স আনে। সেই অর্ডিনেন্সকে আইনে পরিবর্তন করতে ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর আবার লোকসভায় মোদী সরকার তিন তালাক বিল-২০১৮ পেশ করে এবং লোকসভায় পাশ হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় বিরোধীদের প্রতিবাদে পাশ হয়নি এবং ষোড়শ লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন তালাক বিলের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। যেমনটি হয়েছিল ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের ক্ষেত্রে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় তিন তালাক নিয়ে অর্ডিনেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। তাই মোদী সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ২১ জুন তারিখে তিন তালাক বিল পুনরায় লোকসভায় পেশ করে এবং ৩০ জুলাই তারিখে লোকসভায় তিন তালাক বিল পুনরায় লোকসভায় পেশ করে এবং ৩০ জুলাই তারিখে লোকসভায় তিন তালাক বিল পাস হয়। তারপর বহুপ্রতীক্ষিত তিন তালাক বিল গত ৩০ জুলাই রাজ্যসভায় পাস হয়। রাজ্যসভায় ওই বিল পাসের পিছনে বড়ো ভূমিকা রয়েছে ফ্লোর ম্যানেজমেন্টের। তাই সরকার পক্ষে ভোট পড়েছে ৯৯টি এবং বিরোধীদের পক্ষে পড়েছে ৮৪টি। ওই বিলে রয়েছে ৩টি অধ্যায় ও ৮টি ধারা। এই বিলের ধারা ৩ অনুযায়ী লিখিত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাৎক্ষণিক তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক-ই-বিদ্দাত) অবৈধ। তাৎক্ষণিক তিন তালাক একটি ফৌজদারি অপরাধ যার জেরে ৩ বছরের জেল ও জরিমানা হতে পারে। অভিযোগ তখনই নেওয়া হবে যখন কিনা স্বয়ং বিবাহিত মহিলা বা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কেউ অভিযোগ করবেন। মুসলমান স্বামী কর্তৃক তাঁর স্ত্রীর উপর মৌখিক, লিখিত ও বৈদ্যুতিন তাৎক্ষণিক তালাক অবৈধ। যে মুসলমান মহিলাকে তাঁর স্বামী এই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তালাক দিয়েছেন তিনি তাঁর বিচ্ছিন্না স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নির্ধারিত খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়াও এই বিলের ৬ নম্বর ধারা অনুসারে নাবালক সন্তানদের হেফাজতে রাখার অধিকারও পাবেন। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের পাশাপাশি ধার্য হবে এই আইনও। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মতিতেই ধার্য হবে বিবাহবিচ্ছেদ। এই বিল মতে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের জামিন দিতে পারেন। ওই তাৎক্ষণিক তিন তালাকের অভিযোগ নিতে বাধ্য থাকবেন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি এই বিলে সম্মতি দান করেছেন।

উপসংহারে বলা যায়, তিন তালাকের ছোঁদো যুক্তি ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানও বাতিল করেছে। শুধু পাকিস্তান বললে ভুল হবে বিশ্বের আরও ২১টি দেশ এই তিন তালাক প্রথা বাতিল করেছে। 'আধুনিক, দায়বদ্ধ, কল্যাণব্রতী' রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত ভারতে কেন এই সাহসী পদক্ষেপের সমালোচনা হবে। হোক তিন তালাক প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ। যত শীঘ্রই নিষিদ্ধ হবে ততই দেশের মঙ্গল। সত্যি এইসব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। মুসলমান মহিলাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী ন্যায় পাইয়ে দেওয়া সরকারের যেমন কর্তব্য, তেমনি দেশের জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যও তালাকপ্রথা বন্ধ হওয়া জরুরি। রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হওয়ার পর দেশের আইনমন্ত্রী বলেছেন, ''আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। মুসলমান মহিলাদের ন্যায় পাইয়ে দিতে সক্ষম দুই কক্ষ। এটা ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়ার সূচনা।'' ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

গান্ধীজীর অপরিমিত মুসলমান তোষণই দেশভাগ ত্বরান্বিত করেছিল

মণীন্দ্রনাথ সাহা

মানব সভ্যতার পীঠস্থান ভারতবর্ষ। সভ্যতার লীলাভূমি। হাজার হাজার বছরের প্রাচীনতম এই সভ্যতা। যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে শুরু হয় বিদেশি হানাদারদের আক্রমণ। গ্রিক, শক, হুণের ব্যর্থ অভিযানের পর এল মুসলমান আক্রমণ ৮ম শতাব্দীতে। ইরান, ইরাক, মিশরে খুব সহজেই তারা ওই দেশগুলির প্রাচীন সভ্যতাকে সমূলে ধ্বংস করে ওড়াতে পেরেছিল ইসলামের পতাকা। কিন্তু প্রবল বাধা পেল ভারতবর্ষে এসে। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে কলহের কারণে হাজার বছর রাজত্ব করেছে। কিন্তু হিন্দু জাতি ও তার ধর্ম-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে পারেনি। পারেনি তখন তারা ভারতভূমিকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে।

কিন্তু ইংরেজ শাসনে কতিপয় জাতীয় নেতার মাত্রাছাড়া তোষণের সুযোগে ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করে পাকিস্তানের দাবি পেশ করে। মাত্র ৭ বছরের মধ্যে ভারতভূমিকে ধর্মের নামে বিভক্ত করা হলো। জন্ম হলো মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশের। সেখানে ভারতের নামটি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হলো গৌরবময় ভারত সভ্যতা। ভারত বিভাগের জন্য ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হলো দিল্লিতে গভর্নর জেনারেলের প্রাসাদে। স্বাক্ষর করলেন কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল নেহরু ও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন। চুক্তি হলো হাসিমুখে আর করমর্দন করে। আর তখন হিন্দুরক্তে প্লাবন বইল জিন্নার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং হাহাকার শুরু হলো লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা হিন্দু নারীর করুণ আর্তনাদে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখকে পৈশাচিক বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হলো। প্রায় দেড় কোটি হিন্দু-শিখ সর্বস্বান্ত হয়ে এল খণ্ডিত ভারতে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালি অত্যাচারিত, নির্যাতিত, ধর্ষিতা এবং সর্বস্বান্ত হয়ে চলে এলেন শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গে। ভারত বিভাগ বিশ্বের এক ভয়ংকরতম বিপর্যয়। কিন্তু কেন এমন হলো?

এর কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করেন ভারতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আগমনের পর থেকে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ প্রায় রুদ্ধ হয়। বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন কংগ্রেস দলের যোগ্য নেতা, সুদক্ষ সংগঠক এবং প্রশাসক। পক্ষান্তরে নেহরু ছিলেন গান্ধীজীর বিশেষ স্নেহভাজন উপরন্তু মৌলানা আজাদের ভাষায়, মুসলমান তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়। মুসলমানের জন্য একতরফা কল্যাণ চিন্তা ছিল গান্ধীজীর ধ্যান-জ্ঞান। গান্ধীজীর পিতা ছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের জনৈক মুসলমান জমিদারের কর্মচারী। গান্ধীজী নিজেও আইন ব্যবাসায় সাফল্য না পেয়ে একটি মুসলিম কোম্পানির হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। আজন্ম মুসলমান সাহচর্য তাঁর প্রবাদপ্রতিম মুসলমান প্রীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজীর বহিঃরূপ সরল অনাড়ম্বর হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন কর্তৃত্বপরায়ণ, এক নায়ক। সংগঠনে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। তিনি কংগ্রেস দলের কোনো পদাধিকারী ছিলেন না কিন্তু দলকে তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস দলের ভার এমন একজনের উপর থাকবে যিনি তাঁর আজ্ঞা বিনা

প্রতিবাদে পালন করবে। সেই পছন্দের মানুষ ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাইতো গান্ধীজী বলেছিলেন— 'নেহরু সভাপতি হলে আমি ভাবতে পারব আমিই সভাপতি।' (His being in the chair is as good as my being in it)।

গান্ধীজীর ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরের প্রথম পাঁচ বছর ভারতীয় রাজনীতির চূড়ান্ত নেতৃত্ব গ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। দাদাভাই নৌরজি, শ্রী ফিরোজ শাহ মেহতা, লোকমান্য তিলক ও শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখলে তখনও বেঁচেছিলেন। গান্ধীজী যেমন সম্মানিত ছিলেন তেমনি জনপ্রিয়ও ছিলেন কিন্তু এই সমস্ত প্রবীণদের তুলনায় বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন একেবারে নীচের ধাপে। ১৯২০ সালের আগস্টে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী প্রথম সারিতে উন্নীত হলেন।

কংগ্রেস ব্রিটিশের সঙ্গে আপোশ করলে ব্রিটিশরা তাদের বসালেন শক্তিশীর্ষে। পরিবর্তে কংগ্রেস জিন্নার সহিংস নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশে এক সম্পূর্ণ জাতিভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক পৃথক দেশ স্বীকার করে তার হাতে তুলে দিলেন। ফলে ২০ লক্ষ লোক ধ্বংস হলো। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অমুসলমানদের হয় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় অথবা তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও সেই একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবুও গান্ধীজী মুসলমান তোষণের পুরনো নীতি অনুসরণ করতে ছাড়েননি।

গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করে বসলেন। ব্রিটিশরা কয়েক বছরের মধ্যেই দমননীতি ও মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের যৌথ প্রতিক্রিয়ায় খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ কাটিয়ে উঠলেন। আন্দোলন যখন ব্যর্থ হলো মুসলমানরা হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠল আর তাদের রাগ এসে পড়ল হিন্দুদের ওপর। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ শুরু হলো। সব জায়গাতেই লক্ষ্য হলো হিন্দুরা। মোপালা বিদ্রোহেও হলো হিন্দুর ধর্ম, সম্মান, জীবন ও সম্পত্তির ওপর সবচেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ। শত শত হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরকরণ, শত শত মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। যে ধর্মীয় নীতির ফলে ভারতব্যাপী বিপর্যয় টেনে আনলেন গান্ধীজী— তিনি কিন্তু নীরব রইলেন। তাঁর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এক মরীচিকায় পর্যবসিত হলো।

মাহাত্মা তাঁর হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর কৌশল হিসাবে তুরস্কের আলিভাইদের সম্পদে বিপদে সমর্থন করে চললেন। তিনি প্রকাশ্যে তাদের প্রতি প্রীতিবর্ষণ করলেন এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রতিজ্ঞা করলেন। এমনকী আমিরদের ডেকে ভারত আক্রমণের ব্যাপারেও আলিভাইদের সমর্থন করলেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় খোলাখুলিভাবে হিন্দু হত্যা শুরু হলো এবং অপ্রতিহত বেগে চলল তিন দিন। গান্ধীজী গেলেন কলকাতায় এবং এইসব হত্যাকাণ্ডের রচনাকারের সঙ্গে এক বিস্ময়কর বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সুরাবর্দি এবং মুসলিম লিগের হয়ে মধ্যস্থতা শুরু করলেন। পুলিশের নাকের ডগায় অসংখ্য হত্যা ও বলাৎকারের ঘটনা ঘটলেও গান্ধীজী একবারের জন্যও তার নিন্দা করলেন না, বরং প্রকাশ্যে তিনি সুরাবর্দিকে ধর্মপ্রাণ (সৈয়দ) বলে বর্ণনা করলেন। মাত্র দু' মাসের মধ্যে নোয়াখালিতে এবং ত্রিপুরায় পুনরায় হিন্দুহত্যার ঘটনা ঘটল। আর্যসমাজের এক প্রতিবেদনে জানা যায় ত্রিশ হাজার হিন্দু রমণীকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। তিন লক্ষেরও বেশি হিন্দুকে কোতল করা হয়েছিল। কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে লুঠ বা ধ্বংস করা হয়েছিল তার কথা বলা যাবে না। গান্ধীজী নোয়াখালি গেলেন পরিদর্শনে। সঙ্গে নিয়েছেন সুরাবর্দিকে। তা সত্ত্বেও তিনি নোয়াখালি জেলায় ঢুকতে সাহস পেলেন না। এই সমস্ত দাঙ্গা, জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ— সবই ঘটেছিল সুরাবর্দি যখন প্রধানমন্ত্রী। আর অন্যায়ের এত বড়ো একজন দানব সাম্প্রদায়িকতার মতো তীব্র বিষের মতো একজন মানুষকে গান্ধীজী অযৌক্তিক এক উপাধি দিলেন 'সৈয়দ'।

গান্ধীজী 'ভারতছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন, কমিউনিস্টরা স্লোগান দিল— ''পাকিস্তান মানতে হবে, তবে ভারত স্বাধীন হবে''। Divide & quit পার্টির ইস্তেহারে তারা সগর্বে ঘোষণা করে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি মুসলমানের পাকিস্তানের দাবিকে সঙ্গত বলে মনে করে এবং দাবি আদায়ের জন্য কংগ্রেস, কমিউনিস্ট-মুসলিম লিগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।" (The Communist Party is the only Party that recognises Muslim's demand for Pakistan is just and calls the League to achieve the fundamental goal of Pakistan through united struggle of the congress, Muslim League and the Communists.) (Bhawani Sen– Muktir Pathe Bangala).

গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রথম থেকেই আপোশ ও তোষণ নীতি গ্রহণ করে। কংগ্রেসের নীতি বিশ্লেষণ করে ড. আম্বেদকর বলেছেন; কংগ্রেস বুঝতে পারছে না যে আপোশ নীতি মুসলমানকে আরও আগ্রাসী করে তুলছে। (The second thing the congress has failed to realise is that the Policy of Concession has increased Muslim agressiveness.) Dr. B.R. Ambedkar– Writing and speeches, Vol. 8, P. 270.

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Mosley-র বিবরণী হতে জানা যায় যে নেহরু তাঁর জীবনীকার Michel Breacher-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন : ঘটনা হলো, আমরা ছিলাম রণক্লান্ত; বয়সও হয়েছিল। আমরা যদি অখণ্ড ভারতের দাবিতে দৃঢ় ও অবিচল থাকতাম, তবে নিশ্চিত ভাবেই আমাদের স্থান হতো কারাগারে। আমাদের মধ্যে কেউই পুনরায় কারাবাসের সম্ভাবনা ভাবতেও পারতেন না। The truth is that we were tired men and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again– and if we had stood out for a united India as we wished it, Prison obviously awaited us. (R.C. Majunder–History of the Freedom Movement in India, Vol. III, P. 659-660).

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। কিন্তু এর ফলে যে বীভৎস ঘটনা ঘটেছে

অনেকেই মনে করেন তার জন্য গান্ধীজীই ছিলেন সম্পূর্ণভাবে দায়ী। পুরনো খবরে আরও জানা যায়— প্রতিদিন ভারতে সংবাদ আসত যে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, ১৫০০০ শিখকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার হিন্দু রমণীর জামাকাপড় ছিঁড়ে উলঙ্গ করে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হিন্দু রমণীদের গোরু-ছাগলের মতো প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। হাজার হাজার হিন্দু শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছে। চল্লিশ মাইলেরও বেশি লম্বা উদ্বাস্তুর সারি হেঁটে আসছে ভারতের দিকে। পাকিস্তানে যখন এসব ঘটনা ঘটে চলেছে তখন গান্ধীজী একটি একথা বলেও প্রতিবাদ করেননি বা পাকিস্তান সরকার বা সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের নিন্দা করেননি।

গান্ধীজীর প্রাক-প্রার্থনা সভায় হিন্দুদের উদ্দেশে দেওয়া তাঁর বক্তৃতামালা থেকে জানা যায়— ''মুসলমানরা যদি হিন্দুত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্তও করে দিতে চায়— যদি তারা এ বিষয়ে সংকল্পও করে, তবু হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর কখনও ক্রুদ্ধ হবে না। যদি তারা আমাদের সকলকেই হত্যা করে তবে আমরা বীরের মতোই সে মৃত্যু মাথা পেতে নেব। তারা গোটা পৃথিবী জয় করেও নিতে পারে— তবু আমরা এই পৃথিবীতে বাস করব। অন্ততঃপক্ষে আমরা মরতে ভয় পাব না। আমরা যখন জন্মেছি, মৃত্যুও অবধারিত। তবে মৃত্যু নিয়ে এত বিমর্ষ হবার কী আছে? আমরা যদি মুখে হাসি নিয়ে মরতে পারি তবে আমরা এক নতুন জীবনে প্রবেশ করব— এক নতুন হিন্দুস্থান গড়ব। (গান্ধীজীর বক্তৃতামালা— ৬ এপ্রিল, ১৯৪৭)

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে জনকয়েক লোক আজ আমার কাছে এসেছিলেন। তারা সবাই কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী এবং ব্যবসায়ী। আমি তাদের বললাম, আপনারা শান্ত থাকুন। সবচেয়ে বড়ো কথা, ঈশ্বর মঙ্গলময়। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ঈশ্বর নেই। তাঁকে ধ্যান করুন, তাঁর নাম কীর্তন করুন— দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করল, যারা এখনও পাকিস্তানে আছে তাদের কী হবে? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, সবাই কেন এখানে (দিল্লিতে) আসতে চাইবে? কেন তারা সেখানেই মরবে না? আমি এখনও এই মতে বিশ্বাসী যে যদি নিষ্ঠুর আচরণও সইতে হয় এমনকী যদি মরতেও হয়, তবু আমরা যেখানে বাস করতাম সেখানেই মরব। কেউ যদি আমাদের মারে, তবে আমাদের মারতেই দাও না। তবে আমরা বীরের মতো মরব, আমাদের মুখে থাকবে ঈশ্বরের নাম। আমাদের প্রিয়জনদেরও যদি মেরে ফেলা হয়— তবু আমরা কেন কারো ওপর ক্রুদ্ধ হব? এই কথাটা বুঝতে হবে যে কাউকে যদি মেরে ফেলা হয় তবে তাদের একটা যোগ্য এবং মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি হলো। ঈশ্বর আমাদের সকলকে এমন মনোভাব দিন। আমরা এজন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করব। আমি রাওয়ালপিণ্ডির লোকেদের সে উপদেশ দিয়েছিলাম, আপনাদেরও সেই উপদেশ দেব। আপনারা শিখ ও হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাদের রাজনৈতিকভাবে বোঝাবেন যে পুলিশ ও সৈন্যদের সাহায্য না নিয়েই রাজনৈতিকভাবে বোঝাবেন যে পুলিশ ও সৈন্যদের সাহায্য না নিয়েই যেন তারা পাকিস্তানের ফেলে রাখা জায়গায় ফিরে যান।" (গান্ধীজীর বক্তৃতামালা— ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)

খিলাফত আন্দোলন, মোপালা বিদ্রোহ, হাজারে হাজারে হিন্দুহত্যা, দেশভাগ, কাশ্মীর সমস্যা যা কিছু ঘটেছে তা সবই কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট নামক দেশদ্রোহী, হিন্দুদ্রোহীদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থনে। এখনও তার নজির চলছে। ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব V. P. Menon যথার্থই বলেছেন— যে জাতি তার ইতিহাস ও ভূগোল তুলে যায় তার বিনাশ আসন্ন— A Nation that forgets its geography and history, does so as its own Peril।

শতবর্ষ ধরে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বীজমন্ত্র জপ করে হিন্দু আজ বীর্যশুষ্ক নপুংসক। তিন লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করে কাশ্মীর আজ কার্যত পাকিস্তান। মুসলমানদের পরবর্তী লক্ষ্য অসম, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব ভারত। তবে আশার কথা এবারের লোকসভা ভোটে এক মজবুত জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয়েছে।

এদেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ১৯৪৭ সালের দেশভাগের কারণ বিচার-বিশ্লেষণে আর নিমগ্ন থাকেন না। তারা এখন রাজনৈতিক প্রভুদের গুণগানে ব্যস্ত। কিন্তু পর্দার আড়ালে যে পুনরায় ভারত বিভাগের গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে চলেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কেননা এই বিদ্বজনেরাও যে গান্ধীজীর উত্তরসূরি এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ। ■

সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ : অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতার পর প্রায় সাত দশক ধরে লাগু জম্মু ও কাশ্মীরের স্পেশাল স্টেটাস তকমা এবং সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার পর সারা দেশে বিতর্ক জমে উঠেছে। লোকসভার একটি বিতর্কে জম্মু ও কাশ্মীর সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং এই বিষয়ে কোনও আইনি এবং সাংবিধানিক বিতর্ক থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার যে সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার নিয়েছে, লোকসভার অনেক সদস্য তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমি আপনাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দেব।'

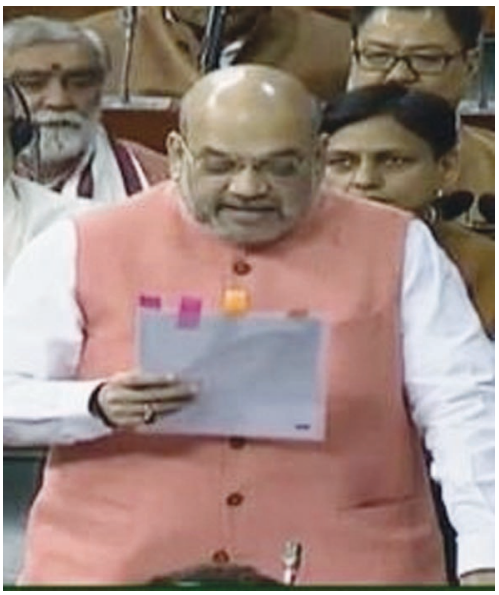

কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, '১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ কাশ্মীরের ওপর লক্ষ্য রেখে আসছে। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা যায় কি?' অধীরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ বলেন, '৩৭০ ধারা বিলোপ কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। সারা দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার সংসদের আছে। ভারত এবং কাশ্মীরের সংবিধানে তার প্রতিবিধানও আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, আমরা যখন জম্মু ও কাশ্মীরের কথা বলি তখন পাক-অধিকৃত কাশ্মীর-সহ সমগ্র কাশ্মীরের কথা বলি। সমগ্র কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ লক্ষ্য রাখতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের নেই।'

কাশ্মীরিদের নিয়ে কথা বলার অধিকার পাকিস্তানের নেই : নাদিম নুসরত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নাদিম নুসরত ভারতে ততটা পরিচিত নন। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ তাকে এক ডাকে চেনেন। নুসরত একজন মহাজির নেতা এবং আমেরিকা-স্থিত সংগঠন ভয়েস অব করাচির চেয়ারপার্সন। তিনি পাকিস্তানের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান থেকে শুরু করে সে দেশের অনেকেই নানারকম বিরূপ মন্তব্য করেছেন। সেই সূত্রেই নুসরতের প্রতিবাদ। তিনি বলেন, 'কাশ্মীরিদের হয়ে কথা বলার কোনও নৈতিক অধিকার পাকিস্তানের নেই।' তাঁর যুক্তি, পাকিস্তান আগে নিজের দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করুক, তারপর কাশ্মীর নিয়ে কথা বলবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তানে মহাজির, বেলুচ, পাখতুন এবং হাজারা সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। কিন্তু পাকিস্তানের সরকার অমানবিক দমন-পীড়নের মাধ্যমে তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। ভয়েস অব করাচি মহাজিরদের সংগঠন। এরা গ্রেটার করাচি নামক এক পৃথক দেশের জন্য লড়াই করছেন। সে দেশ হবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বশাসিত দেশ। নুসরত বলেন, 'পাকিস্তান আগে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে কথা বলুক। তাদের ন্যায্য দাবিগুলিকে মান্যতা দিক। তারপর কাশ্মীর নিয়ে কথা বলবে।' তিনি প্রশ্ন করেন, 'পাকিস্তান মাঝে মাঝেই কাশ্মীরে গণভোটের কথা বলে। আমার প্রশ্ন, পাকিস্তান কি নিজের দেশে অত্যাচারিত অবহেলিত সংখ্যালঘুদের মনের কথা জানার জন্য গণভোট করতে পারবে?' পাকিস্তানের নেতা-মন্ত্রীদের দ্বিচারিতার নানা উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। নানান সভাসমিতিতে অংশ নেন।

ভারতের মন্ত্রীরাও যদি মহাজির পাখতুন নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করেন তাহলে পাকিস্তানের কেমন লাগবে।' নুসরতের পরামর্শ, পাকিস্তান আগে নিজেকে শোধরাক। তারপর অন্যের ভুল ধরবে।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

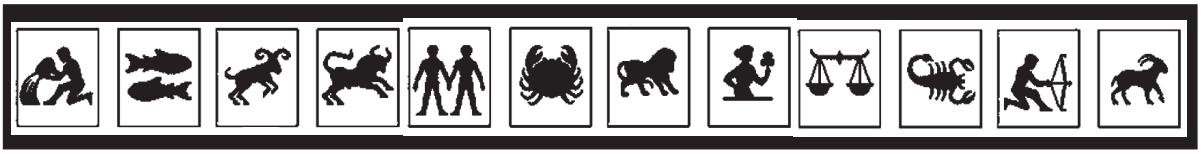

১২ আগস্ট (সোমবার) থেকে ১৮ আগস্ট (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, কর্কটে রবি, বুধ, শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। পুনরায় ১৬ আগস্ট, শুক্রবার, রাত্রি ৯.৩৪ মিনিটে শুক্রের সিংহে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র ধনুতে পূর্বষাঢ়া নক্ষত্র থেকে কুম্ভে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে।

মেষ : অনিয়মের কারণে শারীরিক ক্লেশ-মিত্ররূপী প্রতারক থেকে সাবধানতা ও অতৃপ্ত ভাব, অন্যকে দোষারোপ করে আক্ষেপ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কর্মে সফলতা, সন্তানের শুভ সংবাদে আনন্দ ও গর্ব। অপ্রত্যাশিত ব্যয়। হার্ট ও মুত্রাশয়ের রোগের কারণে সঞ্চয়ে হাত পড়তে পারে। বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়।

বৃষ : সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, মাতৃসুখ, স্বজন বাৎসল্য, সুনাম, কুলশ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি, সদ্ভাব বৃদ্ধি। শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলী, বিদ্যার্থী ও কর্মপ্রার্থীদের নিপুণতা, ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সুপ্রসন্ন ভাগ্য। সপ্তাহের শেষভাগে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও অমিতব্যায়িতায় বিহ্বল চিত্ত।

মিথুন : অগ্রজের উন্নতি, বিদ্বান, পুত্রবান, রুচিবান, শ্রদ্ধাবান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সখ্য, উদারতা। নীতি-নিষ্ঠায় সম্মান ও শংসা। ব্যবসায়ীর নতুন সফল উদ্যোগ, উদ্যম, প্রচেষ্টা, দক্ষতায় পেশাগত পদোন্নতি। স্ত্রীর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বস্ত্র, অলংকার প্রাপ্তি। সন্তানসম্ভবার নেতিবাচক ফল।

কর্কট : বিদ্যার্থীদের উৎসাহ ও মনঃসংযোগ ক্রমবর্ধমান ও সদ্‌গুণের বিকাশ। আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বেকারদের অভীষ্ট ফললাভ। স্ত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে সামাজিক ও সাংসারিক সমৃদ্ধি ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তুচ্ছ কারণে মনান্তর, অনুশোচনা, অস্থিরতা। যুবক বন্ধু হিতকারী নহে।

সিংহ : বিদ্যা, কর্মে সাফল্য, গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ভ্রাতৃসুখ, নিকট ভ্রমণ, নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা। শেয়ার, নির্মাণ শিল্প, পরিবহণ, প্রযুক্তিবিদ, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিভার ব্যাপ্তি, বিত্ত ও সম্ভ্রম। স্ত্রীর জেদি ও বিসদৃশ আচরণ প্রতিবেশীর বিরূপতার কারণ। লেনদেনের ব্যাপারে শুভ ও পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি।

কন্যা : কারিগরি কুশলতা বৃদ্ধি, অর্থাগমের একাধিক সুযোগ। প্রেমজ যোগাযোগে উৎসাহ ও নতুন কোনো ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় ইতিবাচক ফল। নিকট বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য ও ব্যথিত বোধ। যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে প্রশংসিত হলেও সন্তানের চঞ্চল ও বেপরোয়া মানসিকতায় উদ্বেগ। আর্থিক অপ্রতুলতায় সামঞ্জস্যের অভাব।

তুলা : কোমল হৃদয়বৃত্তি, পরোপকারের চেষ্টা, গৃহ ও বাহন যোগ, উচ্চপদস্থের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, কর্মক্ষেত্রে শংসা, উচ্চপদ প্রাপ্তি, চিকিৎসক, গবেষকের সম্মাননা। দোমনাভাব, শরীর ও গোপন শত্রুতায় সতর্ক থাকুন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রিয়জনের সঙ্গসুখ। আর্থিক সুস্থিতি বজায় থাকবে। সংক্রমণ, উদর ও চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : মাতৃস্থানীয়ার আইনি জটিলতা, অসৎসংসর্গ ও সম্মান হানি, বিদ্যার্থীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় প্রবাস ও প্রতিভার স্বাক্ষর। জগতের আনন্দযজ্ঞে কর্মপ্রার্থীর আশু ফলপ্রাপ্তি। সন্তানের প্রতিষ্ঠা পারিবারিক আনন্দ। কীটপতঙ্গ ও শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ধনু : দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ, হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে সমভাগী, ধর্ম-কর্ম, শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে সফল মনস্কাম। গৃহে পুণ্যকর্ম, স্ত্রীর নৈপুণ্যে ব্যবসার প্রসার, সমৃদ্ধি ও লোকপ্রিয়তা। সাহিত্য পিপাসু শিল্পী ও কলাকুশলীদের সৃজনশীলতার ব্যাপ্তি, যশ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা। রমণীদের প্রতি দুর্বলতা ও প্রণয়ের পূর্ণতা।

মকর : পার্থিব সুখে চঞ্চলতা, কর্মক্ষেত্রে চাপ ও ব্যস্ততা, মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, সন্তান-সন্ততির সুকীর্তি, জনহিতকর্মে সুহৃদ সম্পর্ক ও সম্মান। ঝুলে থাকা প্রকল্প ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। আর্থিক স্থিতিতে দুশ্চিন্তার লাঘব। প্রতিবেশীর সৌহার্দ্যমূলক আচরণ ও তীর্থদর্শনে প্রীতিলাভ।

কুম্ভ : স্বজন বাৎসল্য, সুখাদ্য ভোজন, শ্রদ্ধাবান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতা। ভ্রমণ ব্যবসায় সুনাম ও প্রতিপত্তি। সাহসিকতা ও আদর্শনিষ্ঠায় বিরোধিতা হ্রাস। বিজাতীয় রমণীর ব্যবস্থায় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার গতি ত্বরান্বিত। সুগার, প্রেসার ও থাইরয়েড ও জল থেকে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

মীন : সৌভাগ্যের দরজা মজবুত করতে ঠাণ্ডা মাথায় অগ্রসর হতে হবে। পূর্বের নথি থেকে প্রাপ্তি। সন্তানের মেধাজনিত যশ ও আত্মীয়-কুটুম্বের শংসা। স্বাধীন ও শৌখিন ব্যবসায় উন্নতির নতুন দিশা। রাশভারি মেজাজ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল-অজীর্ণ রোগে ক্লেশ।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৬

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - চিহ্নায়ন ● রন্তিদেব সেনগুপ্ত - অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি
প্রবাল চক্রবর্তী - মহিষাসুর নির্ণাশী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - ধুলো

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, মালিনী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
গোপাল চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

প্রবন্ধ

বিজয় আঢ্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রঙ্গা হরি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অর্ণব নাগ, জয়ন্ত ঘোষাল,
সুজিত রায়, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বসু।

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা